একটি কি দুটি পাখি

বুদ্ধদেব বসু

ত্রয়ী প্রকাশনী

প্রথমা

ভেবে-চিন্তে একবার দিল্লি যাওয়াই স্থির করলেন ভূপেশবাবু। ভালো চাকরি—সুবুটাকে ঢোকাতে পারলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। অন্য ছেলেদের নিয়ে কোনো হাঙ্গামা পোয়াতে হয়নি তাঁকে; তারা ঠিক-ঠিক সময়মতো ঠিক-ঠিক লাইন ধ'রে ঢুকে গেছে, আর তার পর থেকে ধাপে-ধাপে উঠেও গেছে নিয়ম-মাফিক। বড়ো ছেলে সুরেন বি.সি.এস পরীক্ষা দিয়ে ইনকম-ট্যাক্সে ঢুকেছিলো, বছর দশেক মফস্বলে ঘোরার পরে কলকাতায় কায়েমি হয়েছে, শিগগিরই অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার হ'য়ে যাবে এই রকম মনে হচ্ছে হাবে-ভাবে। মেজোটি ইকনমিক্সে এম.এ. তার উপর অ্যাক্যাউন্টেন্সি পাশ ক'রে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে ভালো গ্রেডে ঢুকেছে—বারো শো চোদ্দ শো অবধি উঠতে পারেও বা বরাতজোর থাকলে। কিন্তু ছোটোটি—এই সুবু, সে-যে কোনো কাজে-কর্মে মন দেবে এমন কোনো লক্ষণ এখনো দেখা যাচ্ছে না। ছাত্র ভালো ছিলো কলেজে—ভূপেশবাবুর পুত্র-ভাগ্য ভালোই কিন্তু দু-বছর আগে বি.এসসি. পাশ ক'রে তারপর থেকে সুবু যা-কিছু করেছে তার কোনোটিকে 'কাজ' বলতে গেলে ঐ মূল্যবান কথাটার আর জাত থাকে না। খায়, ঘুমোয়, আড্ডা দেয়, সকালে বেরিয়ে কোনোদিন বা বেলা দেড়টায় বাড়ি ফেরে, আর কোনোদিন হয়তো শুয়ে-ব'সে বই প'ড়েই কাটিয়ে দিলো উদয়াস্ত। একবার বললো ম্যাথমেটিক্সে এম.এ. দেবে, তাও কই কিছুই করলো না। মাঝে নাকি গান শিখছিলো, তারও আর-কিছু শোনা গেলো না—শোনা যাচ্ছে না—মাঝে-মাঝে ওর ঘর থেকে রে-গা-মা-সা-নি-সা-র গুনগুনানি ছাড়া। আবার লেখেও—এই সব গল্প নভেল আরকি—অপু নাকি লুকিয়ে দেখেছে তার ছোটোকাকার টেবিলের উপর লেখায় ভরা-ভরা চারটে-পাঁচটা এক্সেসাইজ-বুক। ভালো—এ-সব লেখালেখি মন্দ না নেহাৎ—লেখকদেরও আজকাল মান-সম্মান হচ্ছে দেশের মধ্যে—কিন্তু তার আগে খাওয়া-পরার একটা

ব্যবস্থা চাই তো। ঘর, সংসার, স্ত্রী-পুত্র—তবে তো অন্য সব। কিন্তু চাকরির জন্য তেমন চেষ্টা নেই সুবুর। চেষ্টা নেই মানে গা নেই। তাকে কোনো খবর এনে দিলে সে অবশ্য অ্যাপ্লিকেশন ক'রে পাঠায়, দেখা-সাক্ষাৎও করে, মাঝে-মাঝে নিজেও ঢুঁ মারে এখানে-ওখানে, কিন্তু চাকরি হ'লো না ব'লে একটুও ব্যাজার হয় না, স্যাণ্ডেল ফটফট ক'রে দিব্যি আড্ডা দিতে বেরিয়ে যায়। অথচ এই সুবুকেই ভাবা গিয়েছিলো তিন ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে ব্রাইট—আর কথাবার্তা সত্যি খুব বুদ্ধিমানের মতো, চোখ-মুখ জলজ্বল করে কথা বলার সময়—ওকে দেখে, ওর রকম-সকম দেখে বার-বার দেবুকেই যেন মনে পড়ে ভূপেশবাবুর—যদিও দেবুকে এই বয়সে তিনি বেশি বার ছাখেননি।

এখন এই সুবুর একটা ব্যবস্থা হ'লেই ভূপেশবাবুর আর ভাবনা থাকে না। দুই ছেলে সেটল্‌ড়, তিন মেয়েরই বিয়ে হ'য়ে গেছে—এখন এই কনিষ্ঠ পুত্রটির একটি চাকরি, আর তারপর বিয়ে—এই দুটি ক্রিয়া সম্পন্ন হ'লেই তিনি মনে করতে পারেন তাঁর জীবনের কাজ শেষ হ'লো। এই দিল্লির চাকরিটা একেবারে আইডিয়েল। মিনিস্ট্রি অব এক্সটার্নেল অ্যাফেয়ার্স-এর চাকরি—এক ঝাঁক লোক নিচ্ছে সেখানে—মাইনে ভালো, বিদেশে যাবার সুযোগ আছে, ডিগ্রি ছাড়াও লিট্রেরি কোয়ালিফিকেশন চায়। তা সুবুরও তো কয়েকটা লেখা বেরিয়েছিলো কাগজে, 'ইণ্ডিয়ান মিররে' একটা ইংরেজি লেখাও—ভালো-মন্দ যাই হোক, ছাপার অক্ষর তো। ভূপেশবাবুই চিঠি লিখে এ্যাপ্লিকেশন-ফর্ম আনালেন, পোস্টাল অর্ডার কিনলেন, সুবুর ছাপা-হওয়া লেখাগুলো জোগাড় করলেন খুঁজে-খুঁজে, তারপর সুবুকে দিয়ে লিখিয়ে, সঙ্গে লেখার কাটিং দিয়ে, নিজে পোস্টাপিশে গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন পাঠিয়ে দিলেন।

বিচিত্র ছক-কাটা ফুলিস্কেপের এপিঠ-ওপিঠ চার পাতা ভর্তি সওয়াল-

জবাব লিখে সুব্রত বলেছিলো, 'বা-বাঃ। কত ভাগ্যে প্রপিতামহের নাম জানতে চায়নি!'

ছেলের কথা শুনে ভুপেশবাবু মোলায়েম একটু হাসলেন। 'সরকারি চাকরি কি সোজা কথা রে। আর আজকাল হ'লো পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের ব্যাপার—যোগ্যতা দেখে বাছাই ক'রে নেবে তো!'

'যোগ্যতা!' বাঁকা ঠোঁটে হাসলো সুব্রত। 'হ্যাঁ—যোগ্যতা দেখেই নেয়, এই ভড়ংটা অন্তত চমৎকার বজায় রাখে আজকাল। আবার তার জন্য সাড়ে-সাত টাকা জরিমানা!'

'কী যে বলিস!'

ভুপেশবাবু ছেলের কাছে প্রতিবাদ করলেন, কিন্তু মনে-মনে তাঁরও বিশ্বাস যে ও-সব যোগ্যতা-ফোগ্যতা কিছু না, আসল হ'লো—সেই সনাতন তদবির। অ্যাপ্লিকেশনটি পাঠিয়ে দিয়েই তিনি তাই ভাবতে ব'সে গেলেন কী করা যায়। তাঁর ভাগ্নে পূর্ণেন্দু অবশ্য আছে দিল্লিতে, একটি ছোটো-খাটো কর্তা হ'য়েই বসেছে এতদিনে, তা সে তো আছে মিনিস্ট্রি অব এগ্রি-কালচার-এ—তার কি কোনো হাত থাকবে এ-ব্যাপারে? তা হাত না থাক বুদ্ধি-পরামর্শ দিতে পারবে তো। কাকে ধ'রে কার কাছে যেতে হবে, আবার সেই তাঁকে ধ'রে অন্য কোনো উপরিওলার দরবারে—এই পারম্পর্যটা বাৎলে দিতে পারে যদি পূর্ণেন্দু, সেটাও তো কম লাভ নয়। আর তাছাড়া গিরিজা—তাঁদেরই গ্রামের, গ্রাম-সম্পর্কে ভুপেশ-দা ডাকতো তাঁকে—সে তো এখন মস্ত লোক—মিনিস্ট্রি অব রিহ্যাবিলিটেশনের অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি হয়েছে না? অবশ্য বহুকাল দেখাশোনা নেই গিরিজার সঙ্গে—তা ভুলে তো আর যায়নি, নাম শুনলেই চিনবে, আর একই গ্রামের লোক তো হাজার হোক। দিল্লির সেক্রেটারিয়েটে আর কাকে-কাকে তিনি চেনেন, সে-কথা ভাবতে-ভাবতে মনে পড়লো দেবুর কথা। দেবু অবশ্য সেক্রেটারিয়েটে নয়—না, ও-সব

চাকরি-বাকরি কিছুই সে করলো না কোনোদিন—কিন্তু তার ছবি আঁকাতেই পসার খুব জ'মে উঠেছে আজকাল, প্রায়ই এগজিবিশন হচ্ছে—লম্বা-চওড়া কত সব বেরোয় কাগজে—লণ্ডনে প্যারিসে নিউ ইয়র্কেও দেবব্রত দে-র ছবি নাকি দেখানো হয়, বিক্রি হয়। অথচ এই কলকাতায় যখন ছিলো, কষ্টেই ছিলো—আর সেই কষ্টের ভাগী করার জন্য কোত্থেকে জুটিয়ে আনলো একটা বৌ, কার মেয়ে কী বৃত্তান্ত কেউ জানে না। ভুপেশবাবু তখন কলকাতায় থাকেন না—তখনও তিনি বহরমপুরে হেডমাস্টারি করেন—খবর পেয়ে চার পাতা জোড়া চিঠি লিখলেন, বিয়ে ভেঙে দিতে বললেন, আর তার বদলে বহরমপুরেরই এক জমিদারকন্যার সঙ্গে মোটা কিছু নগদ সুদ্ধু তিনি যে এক্ষুনি ঠিক ক'রে দিতে পারেন সে-কথাটাও সবিস্তারে জানাতে ভুললেন না। সে-চিঠির কোনো জবাব এলো না; বিয়ে হ'য়ে গেলো। কয়েক মাস পরে কলকাতায় এসে ভুপেশবাবু একবার দেখে গেলেন তাঁর বড়ো ছেলেকে, তাঁর মা-র আমলের এক টুকরো সোনা দিয়ে পুত্রবধূর মুখ দেখলেন। বালিগঞ্জের বনজঙ্গল-ভরা কাঁচা-ড্রেন-ওলা রাস্তার উপর পুরোনো একটা জিরজিরে একতলায় তখন থাকে দেবব্রত, চাকব নেই, কাজকর্ম বৌই সব করে। পরের বছর আবার এসে প্রথম নাৎনির হাতে একটি মোহর দিলেন তিনি, দেবব্রতকে অনেক ক'রে বোঝালেন চাকরি নিতে—মেয়ে হ'লো, দায়িত্ব চাপলো কাঁধের উপর, এখন কি আর ছেলেমানুষি চলে। এর পব বছর দুই আর দেখাশোনা হয়নি, যতদিন না সুরেশের বদলির সূত্রে তিনি মাস্টারিতে ইস্তফা দিয়ে সবসুদ্ধু চ'লে এলেন কলকাতায়। আর তখন অবশ্য তিনিই গেছেন মাঝে-মাঝে সময় ক'রে—ঘরভরা ছবি, সামনের ঘরটায় সিগারেটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হ'য়ে রং তুলি নিয়ে ব'সে আছে দেবব্রত, আর ভিতরে সুমিত্রা ঘুরে বেড়াচ্ছে ব্রোঞ্জের চুড়ি প'রে, ডিমসেদ্ধ আর মাখন দিয়ে ভাত

খাওয়াচ্ছে মেয়েকে, স্বামীকে পাঠিয়ে দিচ্ছে চা, কাজ করতে-করতে গল্প করেছে ফাঁকে-ফাঁকে, ভুপেশবাবুকে একদিনও কিছু না-খাইয়ে ছাড়েনি। আর এমনি একদিন নিমকি আর হালুয়া খেতে-খেতে ভুপেশবাবু শুনলেন, দেবব্রত আর কলকাতায় থাকছে না—দিল্লি চ'লে যাচ্ছে। ভালো—লক্ষ্মী তখন ডেকেছিলো তাকে, দিল্লি গিয়ে কপাল খুললো তার। দিল্লিতে অনেকেই তাকে চেনে আজকাল—এর ওর মুখে খবর পান ভুপেশবাবু—রাষ্ট্রপতি-ভবনে তার ছবি গেছে, নেহেরুর নিজের কলেকশনেও নাকি আছে একখানা—তাই তো, এই সুবুব ব্যাপারে দেবুও তাহ'লে কাজে লাগতে পারে তো। নাই বা হ'লো সেক্রেটারিয়েটের কেউ-কেটা—বাইরের লোক ব'লে সুবিধেই বরং, আর আর্টিস্ট ব'লে আলাদা একটা পজিশনও তো আছে তার। তার বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে কেউ যদি থাকে—যদি সে একটু ব'লে-ট'লে দেয়—একটু চেষ্টা করে—কেন করবে না, নিজের জন্য করেনি ব'লে অন্যের জন্য করতে তো আর দোষ নেই!

তাহ'লে দিল্লিবাসী তিনজনকেই জরুরিভাবে চিঠি লিখে দেয়া যাক—তাদের উত্তর এলে তাল বুঝে পা ফেলবেন। কিন্তু চিঠির বিরুদ্ধে কত-গুলো যুক্তি সঙ্গে-সঙ্গেই মনে পড়লো ভুপেশবাবুর। প্রথমত—এই তিনজনের কারো সঙ্গেই বহুকাল তাঁর চিঠিপত্রের সম্বন্ধ নেই, গিরিজার সঙ্গে তো কোনো জন্মেও ছিলো না। হঠাৎ এ-রকম চিঠি পেয়ে কী ভাববে গিরিজা? হয়তো একবার চোখ বুলিয়ে পরমুহূর্তেই ভুলে যাবে সব। আর দেবু—সে-ই বা জবাব দেবে কিনা কে জানে। জবাব নিশ্চয়ই দেবে পূর্ণেন্দু—এ-সব বিষয়ে সে খুব হুঁশিয়ার—বিজয়ায় একখানা পোস্টকার্ড লিখতে ভোলে না এখনো—কিন্তু শুধু একটা চিঠির জোরে কতটুকু কাজ পাওয়া যাবে তার কাছে? আর তাছাড়া, যদি সবাই জবাবও দেয়, চেষ্টাও করে—সে-রকম সম্ভাবনা বেশি নেই ব'লে ধ'রে নেয়াই

ভালো—তবু চিঠি যেতে-আসতে অনর্থক কতগুলো সময় নষ্ট না? ইতিমধ্যে সেই মাছ-ভাত-বিলানো শ্রীক্ষেত্রে কী কাণ্ড হ'য়ে যাবে কে জানে। ওৎ পেতে ওখানেই ব'সে আছে না মাদ্রাজি, পাঞ্জাবি, কাশ্মিরি ছেলেরা, তাদের কত জনের কত মুরুব্বির জোর—তার উপর চাকরির ব্যাপারে নতুন এক আপদ জুটেছে 'ডিস্‌প্লেসড' লোকেরা! না, না, চিঠিপত্রে কিছু হবে না—যেতে হবে, সশরীরে গিয়ে পড়লে একদম 'না'-টা তো আর বলতে পারবে না কেউ—আর বিদেশে আত্মীয়স্বজন দেখলে যে ভালো লাগে তারও তো দাম আছে কিছু। গিয়ে থাকতে হবে কয়েক দিন, সেক্রেটারিয়েটের বিরাট জটিল যন্ত্রের মধ্যে খুঁজে-খুঁজে ঠিক তারটি ধ'রে টান দিতে হবে—তবে তো! কিছু খরচ—তা হোক—কার্যসিদ্ধি হ'লে সব সার্থক।

দুপুরবেলা খাওয়ার পরে স্ত্রীর কাছে তিনি পাড়লেন কথাটা।

শৈবলিনী একটু অবাক হ'য়ে বললেন, 'ছেলের চাকরির জন্য তুমি ছুটবে দিল্লিতে?'

'না-গেলে হবে না। অ্যাপ্লিকেশন করলেই চাকরি হয় শুনেছো কখনো?'

'তা বেশ তো—তাহ'লে সুবুই যাক। তুমি এই বুড়ো বয়সে কেন—'

'সুবু! বেশ মানুষ তুমি! সুবুর যদি গরজই থাকবে তাহ'লে কি আর এতদিন ব'সে থাকে সে! তাকে দিল্লি পাঠালে লাল কিল্লা পুরান কিল্লা আর কুতুব-টুতুব দেখেই হয়তো সময় কাটিয়ে দেবে—আসল কাজ কিছুই হবে না।'

'তা কেন? তুমি ওকে বুঝিয়ে ব'লে দাও, তাহ'লে কি আর—'

'আরে না! ও ছেলেমানুষ, ও কোত্থেকে পারবে ও-সব! যা ঘোরপ্যাঁচের ব্যাপার! আর তাছাড়া, ওকে চেনে কে সেখানে! এই দেবুর কথাই ধরো না—দেবু তো ওকে ছাখেওনি বোধহয় ভালো ক'রে।'

'দেবব্রত ?—তার কি হাত আছে কোনো ?'

'নেই ? কত লোকের সঙ্গে তার চেনাশোনা, গণ্যমান্য অনেকেই তার বাড়িতে আসে, আর তার ছবি--'

'শুনেছি। নেহেরুর বাড়িতে আছে।' ঠোঁটের কোণে একটু হাসলেন শৈবলিনী।

'—মানে, ঐ আরকি। আমার খুব মনে হচ্ছে তাকে দিয়ে কিছু সুবিধে হ'তে পারে এই ব্যাপারে। আর অবশ্য পূর্ণেন্দু আছে, আর গিরিজা—মনে নেই তোমার গিরিজাকে ? সেই চার আনি বাড়ির ?'

'আমাদের কানাইও তো আজকাল দিল্লিতে।'

'ঐ তো—কানাই !' এই শ্যালকপুত্রটির কথা মনে প'ড়ে আরো বেশি উৎসাহিত হলেন ভূপেশবাবু—'দিল্লিতে আত্মীয়স্বজনের অভাব নেই আমাদের। গেলে আরো কত বেরোবে। এমন সুযোগ কি ছাড়তে আছে কখনো ?'

'তাই ব'লে তুমি এই বয়সে—তার উপর শীতকাল—'

'কী করবো—যেতেই হবে! বোঝো না কেন—আমি গেলে ধ'রে-প'ড়ে কিছু-একটা করতেই পারবো। চাকরি তো শুধু একটাই নয়—দিল্লিতে মুড়ি-মুড়কির হরিলুট চলছে আজকাল। তুমি কিছু ভেবো না—দেখো তুমি, আমার কথা যদি ঠিক না হয়। আর ও-রকম বুড়ো-বুড়ো বোলো না তো বার-বার—বুড়ো হবার কী হয়েছে—I am quite fit !' ভূপেশবাবু খাট থেকে নেমে বারান্দায় গিয়ে পানের পিক ফেললেন—ডিবে থেকে আর-একটি পান মুখে তুলে আসনপিঁড়ি হ'য়ে বসলেন আবার।

রাত্রে একটা ফুল্‌-সেশন আলোচনা হ'লো বিষয়টার। তিন ছেলের মধ্যে সুবুই কথা বললো সবচেয়ে কম, আর খানিক পরে উঠেও গেলো

সেখান থেকে। বাড়ির অন্যান্য বয়স্ক পুরুষ, আর মহিলাদের মধ্যে শৈবলিনী—এঁদের মধ্যে ঘোরাঘুরি করলো কথাটা, শেষ পর্যন্ত যাওয়াই সাব্যস্ত হ'লো ভুপেশবাবুর। দিল্লি যাওয়া-আসা দুটো-চারটে টাকার কথা নয়, সংসারের জেনারেল ফণ্ড থেকে না-ভাঙিয়ে সেটা আলাদাই তুলে দিতে রাজি হলো সুরেশ। তার মাইনে বেশি, এ-সব বাড়তি খরচ তার উপরেই পড়ে। ভুপেশবাবু তক্ষুনি বললেন যে তিনি ইণ্টার ক্লাশেই যাবেন—বাঙ্কে উঠে মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকলে আর অসুবিধে কী—একশো টাকাতেই কুলিয়ে যাবে তাঁর। এই প্রস্তাব নিঃশব্দে গৃহীত হবার পর প্রশ্ন উঠলো—তিনি দিল্লি গিয়ে উঠবেন কোথায়। কানাই খুশি হবে খুব, কিন্তু তার সি-ক্লাশ কোয়ার্টার, আর পুর্ণেন্দু যদিও রাইসিনা রোডে বাংলো পেয়েছে, তার ছেলেপুলে অনেক, আর বৌও তেমন মিশুক নয়, বাপের বাড়ির লোকজন ছাড়া পছন্দ করে না—অন্তত তা-ই শোনা গেছে তার সম্বন্ধে, যদিও তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তা যা-ই হোক, পুর্ণেন্দু নিজে তো লোক ভালো, ভালো পাড়াতেও থাকে, সরকারি কেষ্ট-বিষ্টুরা সকলেই ঐ আওতারই মধ্যে—আর ক-দিনেরই বা ব্যাপার, ওখানেই ভালো হবে সব চাইতে। তাহ'লে পূর্ণেন্দুকে কালকের ডাকেই একটা চিঠি—কথাবার্তা এতদুর এগোবার পর ভুপেশবাবু হঠাৎ বললেন যে তাঁর ওঠার জন্য কোনো ভাবনা নেই, দেবুর ওখানেই উঠবেন তিনি। কথাটা শুনে একটু চুপ ক'রে থাকলো সবাই, তারপর এর বিরুদ্ধে যুক্তি দেখালো কয়েকটা। দেবু-দা থাকেন ওল্ড দিল্লিতে, সেক্রেটারিয়েট থেকে বহুদুর—আর দিল্লিতে যান-বাহনে বেজায় খরচ, টাঙ্গা-ভাড়া বিস্তর, আর বাস্-ভাড়াও কলকাতার দ্বিগুণ-তিনগুণ। তাছাড়া দেবুদার সেট্ তো একটু আলাদা রকমের—যে-কাজের জন্য যাওয়া হচ্ছে তার পক্ষে পুর্ণেন্দুই ঠিক মানুষ। 'না, না, তা হয় না। ছেলে থাকতে ভাগ্নের বাড়িতে উঠবো কেন?'

ব'লে ভুপেশবাবু দেয়াল-তাক থেকে পাঁজি পেড়ে আনলেন, দিনক্ষণ দেখে যাত্রার তারিখও ঠিক ক'রে ফেললেন তখনই। আগে একবার জানানো দরকার অবশ্য, পরদিন সকালেই দেবব্রতকে চিঠি লিখতে বসলেন ভুপেশবাবু। প্রথমে লিখতে যাচ্ছিলেন এইভাবে যে তিনি গিয়ে কয়েকদিন থাকলে তাদের কোনো অসুবিধে হবে কিনা—কিন্তু তক্ষুনি মনে হ'লো যে নিজের ছেলের বাড়িতে ওঠার জন্য অনুমতি চাওয়াটা ঠিক হবে না। আর যদি কোনো কারণে জবাব আসতে দেরি হয়, আর সেই পাঁজিতে দেখা শুভদিনটি ফশকে যায়? আর তাছাড়া—তাছাড়া যদি-বা এমন হয় যে দেবু লিখলো অসুবিধে আছে---এমনও হ'তে পারে যে অন্য গেস্ট এখন আছে তার বাড়িতে, কি কারো হয়তো অসুখ—তা কারণটা যা-ই হোক, ও-রকম কোনো জবাব এলে তাঁকে বড়ো লজ্জা পেতে হবে বাড়িতে। না—অত বিলিতি কায়দার কাজ নেই, সাফ লিখে দেওয়া যাক যে যাচ্ছি। তাই লিখে দিলেন ভুপেশবাবু, তারপর যাত্রার অন্যান্য আয়োজনে ব্যস্ত হলেন।

* * *

বেলা ন-টায় ব্রেকফাস্টের টেবিলে পৌঁছলো সেই চিঠি। ডিমের পোচ-ছড়ানো গরম টোস্ট খেতে-খেতে পোস্টকার্ডটিতে চোখ বুলোলো দেবব্রত। মুখ তুলে একটু হেসে বললো, 'মিতু! খবর আছে। ভুপেশবাবু আসছেন।'

'কে?'

'ভুপেশবাবু—তোমার শ্বশুর।'

'কী ছেলেমানুষি করো এখনো।' ধোঁয়া-ওঠা দুধের মধ্যে ওটমীল মিশিয়ে একমুঠো কিশমিশ ছড়িয়ে মেয়ের দিকে এগিয়ে দিলো সুমিত্রা—'চিনিটা তুই নিজেই দিয়ে নে, লিলি, আমি দিলে তো পছন্দ হয় না।—কই, দেখি কী লিখেছেন।'

'এই নাও। যা-হয় একটা জবাবও তুমি লিখে দিয়ো।'

সুমিত্রা মন দিয়ে চিঠি প'ড়ে বললো, 'লিখেছেন তোমাকে, আর জবাব কেন আমি লিখবো?'

'লিখলেই হ'লো। একই কথা। বরং তুমি লিখলেই ভালো। এ-সব বিষয়ে তুমিই তো অথরিটি।'

'হ্যাঁ, যেগুলো অসুবিধের বিষয় সেখানে আমিই অথরিটি বইকি। তা জবাব দেবার তো আর সময় নেই, উনি রওনা হচ্ছেন শুক্রুরবার—তার মানে পরশু।'

'সময় থাকবে না কেন। আজকের ডাকে লিখলে কালকেই পেয়ে যাবেন।'

'কিন্তু লেখবার কী আছে?' ব'লে সুমিত্রা স্বামীর চোখে চোখ রাখলো।

কী-একটা কথা দেবব্রত ঠোঁটের কাছে ভাঁজ ফেললো। কিন্তু তখনই চোখ নামিয়ে নিলো সে, চায়ে চুমুক দিয়ে বললো, 'খুব হঠাৎ! আমি ভেবেই পাচ্ছি না ভূপেশবাবু কেন দিল্লিতে—'

'কী-একটা কাজে আসছেন লিখেছেন তো। আর ও-রকম ভূপেশবাবু-ভূপেশবাবু বোলো না তো—বিশ্রী শোনায়। আর তোমার মেয়েই বা ভাবে কী।'

লিলি এতক্ষণ খেতে-খেতে হাঁটুর উপর খুলে-রাখা একটি বাংলা মাসিকপত্র পড়ছিলো, এইবার মুখ তুলে ব'লে উঠলো, 'কী মা? কে আসছে আমাদের বাড়িতে?'

'তোমার দাদু আসছেন।'

'দাদু! কী মজা!' হাততালি দিয়ে হেসে উঠলো লিলি—'দিদিও আসছেন তো? আর দিদি এলে টুবলুও নিশ্চয়ই ছাড়বে না?'

'ওরা নয়, লিলি, তোমার আরেক দাদু আসছেন। তোমার বাবার বাবা।'

'ও মা, তাই বুঝি?' লিলি একটু চুপ ক'রে থেকে যেন হৃদয়ঙ্গম ক'রে নিলো ব্যাপারটা। 'আমি তাঁকে দেখেছি—না, মা?'

'খুব ছোটো ছিলে তখন।' পেস্তার সঙ্গে কিশমিশ মিশিয়ে মুখে দিলো সুমিত্রা।

'খুব ছোটো ছিলাম, তাই মনে নেই।' ব'লে লিলি হঠাৎ একটু হাসলো, যেন কী-একটা মজার কথা মনে পড়েছে। 'আচ্ছা বাবা, তোমার বাবাকে দেখতে কখনো তোমার ইচ্ছে ক'রে না?'

উত্তরে লিলির বাবা একটু হাসলেন শুধু। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললো, 'শোনো, আমি একটু বেরোচ্ছি এখন। ব্যাঙ্কে যেতে হবে একবার। বেঙ্কটরমন এলে তাকে বসিয়ে রেখো। গান্ধীর পর্ট্রেট চায়—ভালো লাগে না আর ফোটোগ্রাফ থেকে কপি করা—কিন্তু রুটির উপর মাখনটা চাই তো। তার উপর মামলেড হ'লে আরো ভালো।' পাৎলা একটু হাসলো দেবব্রত। 'আর-একটু চা দাও।'

'মামলেড পাওয়া যাচ্ছে না সে কি আমার দোষ?' চা ঢালতে-ঢালতে সুমিত্রা ভুরু বাঁকালো। 'বেরুচ্ছো যখন দেখো না কোথাও পাও যদি। আর সুরযলালকে একবার খবর দিয়ে এসো আসার জন্যে।'

'সুরযলাল আবার কে?'

'ঐ লেপ-তোশকের দোকান—ফোয়ারার ঠিক পাশে—'

'আমি ও-সব পারবো না।'

'পারবে না কী-রকম? চাঁদনি চকেই যাচ্ছো—তোমার ব্যাঙ্ক থেকে দু-পা হাঁটলেই সুরযলাল। নতুন একটা লেপ করাবো কবে থেকেই ভাবছি, এ-উপলক্ষ্যে হ'য়ে যাবে। ভালোই।'

'কোন উপলক্ষ্যে?'

'তোমার বাবা আসছেন, সেইজন্যে—'

'সেইজন্যে নতুন লেপ করিয়ে ফেলবে তুমি?'

'দোষ কী।'

'কম্বল তো আছে বাড়িতে। আর উনি নিয়েও আসবেন।'

'নিয়ে যা-ই আসুন আমি আমার ব্যবস্থা রাখবো তো। কম্বলের অভ্যেস তো নেই ওঁদের—আর দিল্লির শীত।'

'আচ্ছা, ব'লে দেব নগরমলকে।'

'নগরমল না, সুরযমল—তোর পরিজ প'ড়ে রইলো, লিলি?'

'খাচ্ছি, মা।' মাসিকপত্র থেকে মুখ তুলে এক চামচে পরিজ খেয়ে লিলি বললো, 'আমার এমন অবাক লাগছে, মা!'

'কেন?'

'বাবার বাবা আসছেন—এমন অবাক লাগছে ভাবতে।' বড়ো-বড়ো ছলছলে চোখে লিলি তাকালো তার মা থেকে বাবার দিকে।

'বেশি আর অবাক হ'তে হবে না তোমাকে,' দেবব্রত চেয়ারে হেলান দিয়ে সিগারেট নিলো কেস থেকে। 'চটপট খেয়ে নাও এবার, তোমার বাস্ এলো ব'লে।'

বলতে-বলতেই স্কুলের বাস ভেঁপু দিলো বাইরে।

'ও মা! এসে গেছে!' ঢকঢক ক'রে ওভালটিনের পেয়ালা খালি করলো লিলি, এক চুমুক জলে ঠোঁট ভিজিয়ে উঠে পড়লো। 'মা, ওমা—আমার টিফিন? টিফিন কই? ইন্সট্রুমেণ্ট বক্সটা কী হ'লো আবার? ইশ্—কী যে করি! আব এই যে এখানে অ্যাটলাসটা রেখেছিলাম—

'এই তো অ্যাটলাস। আর এই টিফিন—' মা উঠে গিয়ে এগিয়ে দিলেন সব।

'আপেলটা খাস কিন্তু মনে ক'রে। আর এ-রকম খেতে ব'সে গল্প পড়িসনে তো আব—ঐজন্যেই রোজ দেরি হয়ে যায়।'

হাতের কাছে সব পেয়ে লিলির মুখে হাসি ফুটলো। স্কুলের ব্যাগ হাতে নিয়ে দাঁড়ালো এক পলক, মা-র গলা জড়িয়ে ধ'রে চুমু খেলো, বাবার দিকে একবার তাকিয়ে হালকা পায়ে তরতর ক'রে নেমে গেলো সিঁড়ি দিয়ে।

সুমিত্রা ফিরে এসে টেবিলে বসলো, এতক্ষণে মন দিতে পারলো নিজের খাওয়ায়। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললো, 'ঐ কোণের ঘরটা থেকে তোমার ছবিগুলো কিন্তু সরাতে হবে।'

'কেন, ওরা দোষ করলো কী?'

'কেমন জবড়জং হ'য়ে আছে না? সত্যি—ছবিতেই ভ'রে আছে সারা বাড়ি—কেউ এলে যে কোথায়—'

ঠোঁটের কোনে হাসলো দেবব্রত। স্ত্রীর দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললো, 'শ্বশুরের জন্য বড্ড যেন ভাবিত হ'য়ে পড়ছো তুমি?'

'ভাবিত আবার কী। ব্যবস্থা চাই তো সবটারই। প্রস্তুত হ'য়ে থাকাকেই বলে সভ্যতা—তা-ই বলেছিলো না অমিত রায়?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! কিন্তু আমি দেখছি তোমার ভাবটা বেশ খুশি-খুশি।'

'তা অখুশি হবারই বা কী আছে।'

'ওরেব্‌বাবা, এক টুকরো পোস্টকার্ডেই এত। তাও কখনো খোঁজ-খবর নিলে তো আর কথাই ছিলো না।'

'ও-রকম বোলো না তো—ভারি অন্যায়! তোমার জন্মের সময় মা মারা গিয়েছিলেন, দিদিমার কাছে মানুষ হয়েছিলে—এ-সব তো আর ওঁর দোষ নয়। আর এমনিতেও, যখনই দেখা হয়েছে, আমার বেশ ভালোই লেগেছে ওঁকে।'

'দেখা হ'লো কখন যে ভালো লাগলো!' থুতনি উঁচু ক'রে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লো দেবব্রত।

'যেটুকুই হয়েছে কলকাতায় থাকতে।'

'পুত্রবধূটিকে দেখে পুলকিত হয়েছিলেন নিশ্চয়ই! গরিবের মেয়ে। বয়সে আমার ডবল। ফাঁদ পেতে ধরেছে আমাকে। তাঁর চিঠি থেকেই কোট করছি।'

হালকা ছায়া ভেসে গেলো সুমিত্রার মুখের উপর দিয়ে। একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'ওঃ, ও-সব আবার মনে ক'রে রাখে কেউ! কত হয় ও রকম বিয়ের আগে। আর হাজার হোক, তোমারই তো বাবা। তাঁরই রক্ত বইছে তোমার শরীরে। তোমার হাব-ভাব, চলা-ফেরার ধরন—সব তো তোমার বাবারই মতো।'

'তাই নাকি?'

'আর মেয়েটাও হয়েছে সে-রকম—কেমন ছটফটে অস্থির স্বভাব—ছাখো না রোজ স্কুলে যাওয়ার সময়!'

'হুঁ।' সিগারেটের আগুন থেকেই আর-একটা ধরিয়ে নিলো দেবব্রত। 'আমি চলি। আর কোনো ফরমাশ আছে চাঁদনিচকে!'

'যেটা ব'লে দিয়েছি সেটা দয়া ক'রে ভুলো না—তাহ'লেই হবে।'

'ঠিক আছে।' চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো দেবব্রত।

* * * *

শনিবার সন্ধের পরে দিল্লি মেলে এসে পৌঁছলেন ভুপেশবাবু। গায়ে গরম কোটের উপর আলোয়ান, আলোয়ানের ভাঁজের তলা দিয়ে মাফলারের ঝুলমি বেরিয়ে আছে। দেবব্রতই হাজির ছিলো স্টেশনে। তার একটু ভয় ছিলো চিনতে পারবে কিনা, কিন্তু দেখেই চিনলো। বরং ভুপেশবাবুরই প্রথমে একটু খটকা লেগেছিলো দেবব্রতর পরনে পাৎলুন

আর জাকিন থাকার জন্যে। মুখের পাইপ পকেটে রেখে এগিয়ে গেলো সে।

—'এই যে, এদিকে—'

'কে ?—অ, দেবু! ভাগ্যিশ তুমি এসেছো! আমি আরো ভাবছিলাম—কই, কোনদিকে ? এই—কুলি—!' ভুপেশবাবু মালপত্র নিয়ে ব্যস্ত হলেন।

দেবব্রত টঙ্গা ক'রে তাঁকে বাড়ি নিয়ে এলো। মালপত্র সমেত তাঁকে পিছনে বসিয়ে নিজে বসলো টঙ্গাওলার পাশে, সেইজন্য পথটুকু প্রায় চুপচাপই কাটলো। ছাব্বিশ ঘণ্টা ট্রেনের পরে আবার এই টঙ্গার ঝাঁকুনিতে, নতুন শহরে, শীতে, ভুপেশবাবুও জবুথবু হ'য়ে ব'সে রইলেন—মুখে তেমন কথা জোগালো না। কিন্তু বাড়ি এসে, বাথরুমে তৈরি-ক'রে-রাখা গরম জলে হাত-মুখ ধুয়ে, কোটের বদলে সোয়েটারের উপর আলোয়ান জড়িয়ে, বসবার ঘরের নরম কুশানের চেয়ারে তিনি যখন বসলেন, আর সুমিত্রা তাঁর সামনে এনে রাখলো গরম লুচি, ডিমের কুচি-মেশানো আলুভাজা, মাছের চপ, আর ছোটো এক বাটি ছানার পায়েস, তখন খেতে খেতে অনর্গল কথা বেরোলো তাঁর মুখ দিয়ে।

'এই তো আসা হ'য়ে গেলো হঠাৎ। কী ভিড় ট্রেনে—তা আমি কি ভিড়ে ঘাবড়াই—এক ঘণ্টা আগে স্টেশনে এসে বাঙ্কে উঠে লম্বা হ'য়ে শুয়েছিলাম—আর নেমেছি একদম এলাহাবাদে এসে। তা বেশ ক্লাইমেট এদিককার—একটু শীত বেশি—কিন্তু দিব্যি ঝরঝরে লাগে শরীরটি। তারপর তোমরা—বেশ ভালো আছো তো ? ব্যাপারটা হয়েছে কী, সুবুর একটা চাকরি—ঐ যে সুবু—তোমার তো মনে আছে সুমিত্রা, ছোটো ছিলো তখন, তুমি একবার লক্ষ্মীপুজোয় গিয়েছিলে, আর ও কেমন দৌড়ে গিয়ে পুজো হবার আগেই প্রসাদ নিয়ে এসেছিলো তোমার জন্য—

হ্যাঁ, বি. এস্‌সি. পাশ ক'রে দু-বছর ব'সে আছে। আচ্ছা দেবু' (গলা নিচু ক'রে), 'এখানে তোমার চেনাশোনার মধ্যে কি কেউ—' সুবুর চাকরি সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়টি বিস্তারিতভাবে উদ্‌ঘাটন করলেন ভূপেশবাবু।

সব শুনে দেবব্রত বললো, 'আমি অবশ্য এমনিতে চিনি অনেককে, কিন্তু এ-সব চাকরি-বাকরির ব্যাপারে—' ব'লে থামলো।

'শামসুদ্দীন খুব বন্ধু তো তোমার,' বললো সুমিত্রা। 'সে কোন ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারি না?'

'ঐ তো!' ভূপেশবাবুর চোখে হাসি ফুটলো—'ছাখো তো সুমিত্রা, ছাখো তো তুমি মনে ক'রে, নিশ্চয়ই দেবুর বন্ধুবান্ধবের মধ্যে—' মাছের চপ বাধা দিলো কথায়—'মানে, সুরেশ, সুবোধ, ওদের জন্যে তো আর ভাবনা নেই আমার, কিন্তু সুবুর কিছু একটা না-হওয়া পর্যন্ত—'

'নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো আমি, তবে আমার চেষ্টায় কিছু হবে কিনা জানি না।'

'আমার ভাগ্নে পূর্ণেন্দুও আছে এখানে, আর আমাদেরই গ্রামের গিরিজা, সেক্রেটারিয়েটেই আছে তারা—তা আমি ভাবছি—আরে, আরে, করো কী সুমিত্রা, কত লুচি দিলে—তাহ'লে আব রাত্তিরে খাবো কেমন করে।'

'রাত্তিরের খাওয়ার তো দেরি আছে এখনো,' ব'লে সুমিত্রা আর একটি চপ তুলে দিলো শ্বশুরকে, আর স্বামীকে ঢেলে দিলো চা।

'এঁকে দিলে না?' দেবব্রত চোখ দিয়ে ইঙ্গিত করলো তার বাবার দিকে।

'উনি তো চা খান না।'

'না, না, চা খাই না আমি। কোনো জন্মে খাইনি।'

'তাহ'লে আমি বরং চা-টা নিয়ে ও-ঘরে—' পেয়ালা হাতে নিয়ে তক্ষুনি

উঠলো দেবব্রত, তার স্টুডিওতে এসে আরাম ক'রে ব'সে চা খেলো, আর একটির পর একটি সিগারেট। এতক্ষণ সিগারেট না-খেয়ে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিলো তার।

এই ফাঁকে দু-একটা সাংসারিক খোঁজ-খবর নিলেন ভূপেশবাবু। পায়েসের বাটির সদগতি ক'রে, ওখানে ব'সেই গরম জলের বাটিতে আঙুল ডুবিয়ে, তারপর একসঙ্গে দুটি পান মুখে দিয়ে এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে জিগেস করলেন, 'এ-বাড়িতে ক-দিন আছো?'

'বছর পাঁচেক হবে।'

'বেশ বাড়ি,' একটু ভেবে মত দিলেন ভূপেশবাবু। 'তবে আর-একটু বড়ো হ'লে—'

'হ্যাঁ, একটু ছোটো—তা আমাদের কুলিয়ে যায় কোনোরকমে।'

'কত ভাড়া?'

'সত্তর টাকা।'

'ভাড়া তো বেশি না। এদিকে আমরা শুনি যে দিল্লিতে—'

'পুরোনো বাড়ি—সারাই-টারাই নিজেরাই সব করিয়ে নিয়েছি, তাই—'

'আমি আরো ভাবলুম মস্ত বাড়ি দেখবো তোমার, সামনে বাগান, বড়ো-বড়ো বারান্দা—'

এর উত্তরে সুমিত্রা শুধু একটু হাসলো।

'গাড়ি আছে তো?'

'গাড়ি? না তো। গাড়ি কোত্থেকে থাকবে।'

'তবে যে সব শুনি চারদিকে—কত নাম আজকাল দেবুর—কাগজে সব বেরোয় বড়ো-বড়ো—'

এর উত্তরেও সুমিত্রা একটু হাসলো।

'ভালো—ভালো—' একটু চুপ ক'রে থেকে ভূপেশবাবু বললেন—'গাড়ি

দিয়ে হবেই বা কী—অনর্থক খরচ কতগুলো। তাব চেয়ে সঞ্চয় করা অনেক ভালো। এই বিদেশেই তো আর জীবন কাটবে না, আস্তে-আস্তে—' গলা নিচু করলেন তিনি—'কলকাতায় একটু জমির চেষ্টা করো, বুঝলে? দেবুর তো এ-সব দিকে একদম হুঁশ নেই, তুমি একটু বুদ্ধি ক'রে—'

'আপনি জর্দা খান না?' হঠাৎ ব'লে উঠলো সুমিত্রা। 'আনিয়ে দেবো?'

'না, না, আছে, আছে আমাব কাছে। আর আজকাল খাইও না তেমন। বোসো তুমি। তা—কথাটা হচ্ছে—' মনের কথাটা এবাব খুলেই বললেন ভুপেশবাবু—'দেবুর বোজগাব কী-বকম হচ্ছে আজকাল? খুব ভালো নিশ্চয়ই!'

একটু লাল হ'লো সুমিত্রা। নিজেকে যেন সামলে নিয়ে আস্তে বললো, 'আমাদেব চলে যায়।'

'আহা, চ'লে তো যায় কত লোকেবই। তাতে আর কী হ'লো। কাব কত সঞ্চয় হ'লো সেটা দিয়েই তো কথা। বুঝলে না?'

এবাব সুমিত্রা হেসে ফেলে জবাব দিলো, 'আমাদেব কই তেমন জমে-টমে না।'

'কেন? উচিত তো! এক-একখানা ছবির দামই নাকি দু-শো টাকা পাঁচশো টাকা—'

'তা ছবি কি আর রোজ-রোজ বিক্রি হয়?'

'তা সত্যি, তা সত্যি,' ভুপেশবাবু মাথা নাড়লেন। 'তা-ই তো বলি আমি, বাঁধা চাকরির মতো আর কিছুই না। সুরেশের কথা বলিনি বুঝি—' ঠোঁটে হাসি ফুটলো ভুপেশবাবুর—'সে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনাব হ'য়ে যাবে শিগগিরই—তা-ই তো শোনা যাচ্ছে—আর সুবোধও একটা ইনক্রীমেণ্ট

পেলো এবার—এখন স্বুবুর কিছু একটা হ'লেই—' ঘুরে-ফিরে আবার স্বুবুর কথাতেই এলেন তিনি।

তাঁর কথার মাঝখানে দেবব্রত ফিরে এলো ঘরে। 'এই যে, দেবু!' তাকে দেখেই আগের কথাটা থামিয়ে দিলেন ভুপেশবাবু—'সব খবর শুনছিলাম সুমিত্রার কাছে। বেশ, বেশ। কিন্তু বাড়ি একদম চুপচাপ যে? ছেলেমেয়েরা কোথায়?'

'লিলি তার এক বন্ধুর বাড়ি গেছে,' জবাব দিলো সুমিত্রা।

'লিলি! সেই যাকে বাচ্চা দেখেছিলাম? তারপর? আর?'

একটু চুপ ক'রে থাকলো স্বামী-স্ত্রী দু-জনেই, সুমিত্রা একটু লাল হ'লো। দেবব্রত বললো, 'ঐ একটিই।'

'একটিই? আশ্চর্য! খুব অদ্ভুত! ছেলে হয়নি?'

সুমিত্রা মুখ ফিরিয়ে থাকলো, আর দেবব্রত গম্ভীরভাবে জবাব দিলো, 'না, ঐ একই মেয়ে। আর কিছু হ'লে শুনতেন নিশ্চয়ই।'

'তাও তো বটে, তাও তো বটে!' এবার লাল হলেন ভুপেশবাবু, 'আমি জানবো না, তা কি আর হ'তে পারে। তোমরাও একটা খবর দিতে বইকি। কিন্তু—একটা ছেলে হ'লো না! সুরেশের তিন ছেলে জানো তো, আর সুবোধের এক ছেলে এক মেয়ে। সুরেশের বড়ো ছেলে—অপু—ওঃ সে যা এক গুণ্ডা হয়েছে!—' নাতিদের কীর্তিকাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন তিনি, দেবব্রত হাতের উল্টো পিঠে হাই চাপলো।

এমন সময় লিলি বাইরে থেকে এসে ঘরের মধ্যে একবার মাত্র একটুখানি তাকিয়ে ভিতরে চ'লে গেলো।

ভুপেশবাবু কনিষ্ঠ পৌত্রের প্রসঙ্গের মধ্যে থেমে গেলেন হঠাৎ। জিগেস করলেন, 'ও-মেয়েটি কে, সুমিত্রা?'

'কোন—?'

'এই যে এইমাত্র এলো।'

'ও তো লিলি।'

'লিলি? তোমার মেয়ে?'

'ডাকি ওকে।' সুমিত্রা উঠে গিয়ে মেয়েকে নিয়ে এলো।

হলদে রঙের উলের ব্লাউজের উপর টুকটুকে লাল সিল্কের শাড়ি পরা, নেমন্তন্নের বিশেষ সাজে সলজ্জভাবে দরজার ধারে দাঁড়ালো এসে লিলি। ভুপেশবাবু ভুরু কুঁচকে তাকালেন।

'লিলি, আয়,' ডাক দিলো সুমিত্রা। 'দাদুকে প্রণাম কর।'

এঁকে-বেঁকে এগিয়ে এসে অনভ্যস্ত হাতে কোনোরকমে একটা প্রণাম সেরে লিলি উঠে দাঁড়ালো। যেন বুঝতে পারলো না এর পর তার কী করা উচিত; ঘরের মাঝখানেই দাঁড়িয়ে থাকলো। ভুপেশবাবুও কিছু বললেন না, তাঁর মুখের ভাব যেন বদলে গেলো হঠাৎ।

'বোস—' সুমিত্রা তার পাশের জায়গাটা দেখিয়ে দিলো।

'হ্যাঁ, বোসো, বোসো, দাঁড়িয়ে কেন?' ভুপেশবাবু অন্যমনস্কতা থেকে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলেন—'তাহ'লে—এই মেয়ে? বাঃ! বোসো, দিদি, বোসো। কোথায় গিয়েছিলে?'

'এক বন্ধুর বাড়িতে—' লজ্জা-পাওয়া গলায় জবাব দিলো লিলি।

'বেড়াতে?'

'জন্মদিন ছিলো।'

'জন্মদিনের নেমন্তন্ন? বেশ, বেশ।—সুন্দর মেয়ে হয়েছে,' ভুপেশবাবু সহাস্যে ছেলের দিক থেকে বৌয়ের দিকে তাকালেন। 'তা এক নতুন ভাবনা চাপলো তোমাদের—ষোলো বছর বয়স হ'লো মেয়ের।'

'ষোলো না তো। এই তো তেরো পূর্ণ হ'লো এবারে।'

'তেরো? বলো কী? আচ্ছা দাঁড়াও, আমি ওকে যখন দেখেছিলাম—'

'আপনি ওকে যখন দেখেছিলেন,' দেবব্রত কথা বললো এবার, 'তখন ওর বয়স বছর তিনেক ছিলো। তা বয়সের আন্দাজে একটু বড়োই দেখায় ওকে।'

'বছর তিনেক? তা তখন ছিলো নাইন্টিন—কী হ'লো? এত হাসি কেন?' ভূপেশবাবু নাৎনির দিকে মুখ ফেরালেন, লিলি তখন মা-র কাঁধে মুখ লুকিয়ে কেঁপে-কেঁপে হাসছে। 'কী গো, এত হাসি?'

'কিছু না। যত ছেলেমানষি!' সুমিত্রা নিজেও মুখ টিপে হাসলো।

'শুনি না, ব্যাপারটা কী।'

'ওর বাবার কথা শুনে হাসছে। বাবাকে আবার কেউ আপনি বলে নাকি? এই, থাম না! কী অসভ্যতা।'

'মুখটা তোলো না একটু। এত লজ্জা কিসের?' বললেন ভূপেশবাবু।

লিলি হাসি সামলে মুখ তুললো। হাসিতে লজ্জায় টুকটুকে লাল দেখালো তার ফর্শা মুখটি। ভূপেশবাবু চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকলেন।

'শাড়িটা ছেড়ে রাখ এবার। ভাঁজ ক'রে রাখিস কিন্তু।'

'কেন, থাক না,' বললেন ভূপেশবাবু। 'বেশ তো আছে।'

'ছেলেমানুষ, ছিঁড়ে-টিঁড়ে ফেলবে। আর শাড়িটা ওর এখনো তেমন রপ্তও হয়নি। যাও, লিলি।'

লিলি যাবার পর চুপচাপ কাটলো একটু। তারপর সুমিত্রা ন'ড়ে-চ'ড়ে বললো, 'আমি তাহ'লে—আপনি কি একটু বিশ্রাম করবেন? বিছানা ক'রে দিয়েছে।'

'না, না, শোবো না এখন, এই বেশ আছি। হ্যাঁ, তোমরা যাও—দেবু, তুমিও তোমার কাজ করো গে। বাঃ, সুন্দর ছবি সব—সব তোমার আঁকা, দেবু?'

'সব আমার না।'

'ওটা, ঐ যে—' ভূপেশবাবু একটি মেয়ের পর্ট্রেটের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন।

'ওটা অবশ্য ওঁরই—এই সেদিন শেষ করলেন।'

'খুব ভালো হয়েছে তো।' ভালো ক'রে দেখার জন্য ভূপেশবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

'আপনি বসুন, আমি নামিয়ে দিচ্ছি।' দেয়াল থেকে ছবিটা পেড়ে টেবিলের উপর রাখলো সুমিত্রা। ভূপেশবাবু সেটা হাতে নিয়ে বললেন, 'লিলির ছবি, না? দেখে মনে হয়—' কথা শেষ না-ক'রে আরো একটু দেখলেন, তারপর হঠাৎ মুখ তুলে বললেন, 'আর দেরি কোরো না তোমরা। এবার বিয়ে দাও।'

'বিয়ে! কার?'

'আহা—তোমার মেয়ের। মেয়ের বিয়ে দেবে না?'

'এখনই!' দেবব্রত ছোট্ট হেসে উঠলো।

'না, না, বুঝছো না তোমরা। ষোলো বছর হ'লো, এটাই ঠিক সময়।'

স্বামী-স্ত্রীতে দ্রুত চোখাচোখি হ'লো একবার। সুমিত্রা বললো, 'ষোলোতো হয়নি, সবে তেরো। আর ষোলোকেও ছেলেমানুষ বলে আজকাল।'

'আহা, বললেই হ'লো! বলে বাধ্য হ'য়ে, বিয়ে হয় না ব'লে, পাত্র জোটে না ব'লে। তা তোমাদের সুন্দরী মেয়ে—সে-জন্যে তো আর ভাবনা নেই। বলো তো আমি কলকাতায় ফিরে—বুঝছো না—এ-রকম সময় আর—' হঠাৎ থামলেন ভূপেশবাবু, একটু অপ্রস্তুত-মতো হাসলেন। 'বিয়ে কিন্তু কলকাতাতেই হওয়া চাই। আমরা আছি পাঁচজন, আর কত সব—ঐ ছাখো! ভুলেই ছিলাম এতক্ষণ। সন্দেশ এনেছি তোমাদের জন্য—এখানে আর যা-ই পাও কলকাতার মতো সন্দেশ তো আর পাও না—একটু খাও তোমরা—ফাস্ট ক্লাশ সন্দেশ—আমি নিজে দোকানে গিয়ে—কই, আমার

চাবিটা ?' ভূপেশবাবু পকেট হাৎড়ালেন।

'আচ্ছা, আচ্ছা, পরে হবে। আপনি বসুন এখন—'

'না, না, এখনই চেখে ভাখো একটু—দিদিকে দাও—'

'ও আর এখন খাবে না। এই তো খেয়ে এলো।'

'তা হয় না, তা হয় না, একটু খেতে হবে বইকি—আমার জিনিশগুলো কোথায় রেখেছে ?' ভূপেশবাবু ব্যস্ত হ'য়ে উঠে পড়লেন।

• • •

এর পর কয়েকটা দিন খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটলো তাঁর। পূর্ণেন্দু গিরিজা, শামসুদ্দীন, এঁকে ধ'রে ওঁকে, ওঁকে ধ'রে তাঁকে, ঠিক-ঠিক যে-রকম তিনি ভেবেছিলেন। কোনো-একটি চেষ্টা তিনি বাকি রাখলেন না, কোনো পরিশ্রমে পেছ-পা হলেন না, কোনো সাহায্যের সুদূরতম সম্ভাবনাও যেখানে আছে, সেখানেও দেখা ক'রে তবে ছাড়লেন। দেখা করা কি সোজা! হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটোছুটি, বাড়ি খোঁজা, নয়া দিল্লির গোলকধাঁধায় বার-বার পথ হারানো, কর্তাদের খাশ কামরার বাইরে ঘণ্টাখানেক ক'রে ব'সে থাকা, তারপর এ-ডিপার্টমেণ্ট থেকে সে-ডিপার্টমেণ্ট, সাউথ ব্লকের পঁয়ত্রিশ নম্বর ঘর থেকে সেণ্ট্রাল ব্লকের বিরাশি নম্বর ঘর, সেখান থেকে বিলিয়ার্ড বলের মতো ঠোক্কর খেয়ে ফের সাউথ ব্লকে—সেক্রেটারিয়েটের সিঁড়ি ভাঙতে-ভাঙতে তাঁর পঁয়ষট্টি বছরের পা দুটো টাটিয়ে উঠলো। এ তো গেলো একটা দিক, তার উপর নেমন্তন্ন! পূর্ণেন্দু, গিরিজা, কানাই—এরা তো আছেই, তার উপর আরো কত আত্মীয় বেরোলো, সকলেই বলে আমার ওখানে একদিন—কিন্তু এই যান-বিরল ছড়ানো শহরে ব্যস্ততার মধ্যে মাত্রই পাঁচ-ছ'দিনের মেয়াদে ক-টা আর নেমন্তন্ন রাখা যায়—তবু মোটের উপর ব্যাপারটা

দাঁড়ালো এইরকম যে বাড়িতে, অর্থাৎ দেবব্রতর বাড়িতে, তাঁকে ভালো ক'রে দেখাই গেলো না এ-ক'দিন, সকালবেলা লুচির সঙ্গে বাড়িতে তৈরি তিন-চার রকম মিষ্টি, কিংবা কোনোদিন হয়তো গরম-গরম ভাত মাছের ঝোল খেয়ে সেই যে বেরিয়ে গেছেন, আর ফিরেছেন কোনোদিন সন্ধেবেলা, আর কোনোদিন একেবারে রাতের খাওয়া সেরে এগারোটা নাগাদ। আর তারপর আর কথাবার্তা না—শিয়রে ঢাকা-দিয়ে-রাখা জলের গ্লাশটি শেষ ক'রে লেপের তলায় হট-ওয়াটার-ব্যাগ দিয়ে গরম-ক'রে-রাখা বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুম।

অবশেষে কাজ তাঁর শেষ হ'লো—অন্তত নিজের মনে তিনি বিশ্বাস করতে পারলেন যে সুবুর চাকরি বিষয়ে আর-কিছু তাঁর করবার নেই। হ্যাঁ—আসাটা সার্থক হয়েছে তাঁর, চারদিকে ঘুঁড়তে-ঘুঁড়তে যথাস্থানীয় কোনো-একটি কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছতে পেরেছিলেন শেষ পর্যন্ত, আর সেই কর্তৃপক্ষটি—ঠিক কথা দেননি—তা কি আর দিতে পারেন?—তবে আশা দিয়েছেন, হাবে-ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে এই আবেদনে তাঁর অনুমোদন আছে। পূর্ণেন্দু বলেছে, 'হ'য়ে যাবে, ভাববেন না.' গিরিজাও তা-ই বলেছে—'আমরা তো আছি।' আর কী—চেষ্টা যদ্দুর হয় করা গেলো, এখন ভাগ্য। এবার তাড়াতাড়ি ফিরে খবরগুলো দিতে হয় বাড়িতে, সুবুকেও তৈরি ক'রে রাখতে হয় ইণ্টারভিয়ুর জন্য। সেদিন সেক্রেটারিয়েট থেকে বেরিয়েই টিকিট কিনে ফেললেন তিনি, পথে চাঁদনি চকে নেমে নাতি-নাৎনিদের জন্য কিছু খেলনা কিনে ফিরে এলেন।

তখন বেলা দুটো, দেবব্রতর ফ্ল্যাট চুপচাপ। ভূপেশবাবু প্রথমে নিজের ঘরে গিয়ে খেলনাগুলো বাক্সে ভ'রে জিনিশ গুছোলেন, তারপর বেরিয়ে এলেন কারো দেখা পাবার আশায়। বসবার ঘর খালি, পার্টিশন-

দেয়া খাবার ঘরেও কেউ নেই, কিন্তু তার পাশেই ছোটো ঘরটায় পরদার ফাঁকে দেখতে পেলেন লিলিকে। পরদা ঠেলে ঢুকে পড়লেন।

'কী? কী খবর?'

লিলি টেবিলে ঝুঁকে একমনে কী করছিলো, গলা শুনে চমকে মুখ তুললো।

'কী করছিলে অমন একমনে?'

'কিছু না,' সলজ্জ একটু হাসলো লিলি, ম্যাপ-আঁকার খাতাটা বন্ধ ক'রে উঠে দাঁড়ালো।

'মা কোথায়?'

'মা আছেন—' লিলি আঙুল দিয়ে পাশের ঘরটা দেখালো।

'বাবা?'

'বাবা কাজ করছেন—স্টুডিওতে। মা-কে ডাকি।'

'না, না, ডাকতে হবে না—ঘুমুচ্ছে বোধহয়। তুমি বোসো।'

'আপনি বসুন।'

'বসছি।' সুজনিতে ঢাকা বিছানার উপর বসলেন ভূপেশবাবু। চারদিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই ঘরে থাকো বুঝি তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'এই স্কুল থেকে এলে?'

'আজ তো স্কুলে যাইনি। আজ শনিবার—ছুটি।'

'তাহ'লে ফ্রক প'রে আছো যে?'

'এমনি।'

'এই নীল ফ্রক তো স্কুলের?'

লিলি মাথা নাড়লো।

'বাড়িতেও প'রে থাকো?'

'পরি মাঝে-মাঝে।'

'শাড়ি পরো না?'

'তাও পরি।'

'শোনো—শাড়িই পরবে এখন থেকে। কত ভালো দেখায় শাড়িতে।'

'আমি তো শাড়ি পরতেই চাই, কিন্তু স্কুলে ফ্রক প'রে যেতে হয় কিনা।'

'তাতে কী। বাড়িতে শাড়ি পরবে। মা-কে বলবে তোমাকে ভালো-ভালো তাঁতের শাড়ি কিনে দিতে। ঢাকাই, টাঙ্গাইল, ময়নামতী—পাওয়া যায় তো এখানে?'

'আমি ঠিক জানি না।'

'নিশ্চয়ই যায়—আর না যায় তো কলকাতা থেকে আনিয়ে নেবে। বুঝেছো না—এখন বড়ো হয়েছো, এখন কি আর শাড়ি না-পরলে মানায়।'

'আমার খুব বড়ো হ'তে ইচ্ছে করে।'

'ইচ্ছে করে? বড়ো তুমি হ'য়ে গিয়েছো—জানো না তুমি? এখনো জানো না—জানবে—দেরি নেই তার। তাহ'লে এই কথা রইলো তোমার সঙ্গে। এখন থেকে শাড়ি—কেমন?'

লিলি হাসলো, খুশির একটি আভা ছড়ালো তার মুখে।

সেই মুখের দিকে তাকিয়ে ভূপেশবাবু বললেন, 'এক গ্লাশ জল দিতে পারো?'

'হ্যাঁ—নিশ্চয়ই।' লিলি দৌড়ে গিয়ে জল নিয়ে এলো খাবার ঘর থেকে।

'পান খাবেন?'

'পান কি তৈরি আছে?'

'মা সেজে রেখেছেন আপনার জন্তে। নিয়ে আসছি।' একটি জয়পুরি রেকাবিতে ভিজে ন্যাকড়ায় ঢাকা পান নিয়ে এলো লিলি।

ভূপেশবাবু পান মুখে দিয়ে বালিশে কনুই রেখে আড় হলেন বিছানায়।

'বাঃ, বেশ পান। তুমি একটা খাবে নাকি?'

'আমি পান খাই না।'

'কোনোদিন খাওনি?'

'না, না, তা নয়, তবে—'

'তবে আবার কী। খাও একটা।'

'বাবা বকবেন।'

'অঃ, বকবেন! সে নিজে খায় না বুঝি?'

'বাবা কক্‌খনো খান না। শুধু মা মাঝে-মাঝে—'

'কিছু হবে না। কেউ বকবে না। খাও তুমি।'

লিলি সাগ্রহে একটি পান তুলে মুখে দিলো। এই নিষিদ্ধ এবং ঈপ্সিত আস্বাদে চোখ দুটি বড়ো-বড়ো হ'য়ে উঠলো তার।

ভূপেশবাবু বললেন, 'বাঃ, তুমি সেই দাঁড়িয়েই আছো তখন থেকে? বোসো না।' কিন্তু লিলি বসলো না, চেয়ারের পিঠ ধ'রে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই বললো, 'আর-কিছু লাগবে আপনার?'

'না, আর-কিছু লাগবে না। শোনো—'

কিন্তু ভূপেশবাবু আর-কিছু বললেন না। কী বলতে যাচ্ছিলেন তিনি? হঠাৎ যেন ভুলে গেলেন, কেমন ঝাপসা দেখলেন চোখে, আর সেই ঝাপসার মধ্যিখানে উজ্জ্বল একটি রেখা, পান খেয়ে লাল-হ'য়ে-ওঠা দুটি ঠোঁট, লাবণ্য-ভরা একটি মুখ, কালো চুলের তলায় ফর্শা একটি কপাল। সিঁদুর নেই কেন?

লিলি দেখলো তার দাদুর চোখ বুজে আসছে, হাতের পাতায় ভর-রাখা মাথাটা ঢুলে আসছে ক্রমশ। মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে থাকার পরেও তিনি যখন আর কথা বললেন না, তখন লিলি ভাবলো এবার সে চ'লে গেলেও ক্ষতি নেই।

কিন্তু সে দু-পাও যায়নি এমন সময় ভূপেশবাবু ডাক দিলেন, 'বাঃ, যাচ্ছো কোথায় ?'

'যাচ্ছি না—' লিলি ঘুরে দাঁড়ালো। 'আপনি ঘুমিয়ে পড়ছিলেন, তাই—'

'না তো! কখন ঘুমোলাম ?' ভূপেশবাবু ত্রস্তে নেমে পড়লেন খাট থেকে, একটু লজ্জিতভাবে বললেন, 'বোসো তুমি, বোসো, তোমার কাজ করো ব'সে-ব'সে। কী করছিলে ? ম্যাপ ?' ম্যাপের খাতাটা একবার ওল্টালেন তিনি, দুই পাতার ফাঁকে বেরিয়ে পড়লো লাল নীল সোনালি রুপোলি চকচকে এক গোছা কাগজ। পাছে তার এই সম্পদ অসাবধানে নষ্ট হয়, লিলি হাত তুলে কাছে আসতে-আসতে লজ্জা পেয়ে থমকে দাঁড়ালো।

'কী এগুলো ?'

'রাংতা।'

'রাংতা ? তুমি জমাও বুঝি ?'

'আমার খুব ভালো লাগে।'

'খুব সুন্দর।' ভূপেশবাবু আস্তে হাত বুলোলেন একটির গায়ে, হাতে তুলে মুখের উপর রাখলেন একবার। কেমন একটা গন্ধ লেগে আছে, নাম নেই সেই গন্ধের—মেয়েলি গন্ধ।

'কোথায় পাও ?'

'কিনতে পাওয়া যায়। আবার বন্ধুদের মধ্যে অদল-বদল করি।'

'তা-ই বুঝি ? কোন দোকানে পাওয়া যায় ?'

'মনোহারি দোকানে। আপনি নেবেন ? আমি খুব ভালো দোকান চিনি—এনে দেবো।'

এই শেষের কথাটা ভূপেশবাবু বোধহয় শুনলেন না। ততক্ষণে তিনি টেবিলের উপর আরো দু-একটা জিনিশ নেড়ে-চেড়ে দেখছিলেন—স্কুলের

খাতা, গল্পের বই, কোনোটার মধ্যে শুকনো একটা ফুল, কোনোটার মধ্যে কাগজ থেকে কাঁচি দিয়ে কাটা একটা ছবি,আর 'সব-কিছুর মধ্যেই—প্রত্যেকটা বইয়ের পাতার ফাঁকে-ফাঁকেই—অনেকদিনের পুরোনো একটা চেনা-চেনা গন্ধ। ভুপেশবাবু দাঁড়িয়ে থাকলেন খানিকক্ষণ, হঠাৎ হাতের বইটা বন্ধ ক'রে যেন আপন মনে বললেন, 'চলি।'

লিলি আবার বললো, 'আপনি বসুন—মা-কে ডেকে আনি।'

ভুপেশবাবু জবাব না-দিয়ে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লেন। ক্লান্ত হয়েছেন, বোধহয় ঘুমও পেয়েছে। এ-ক'দিনের ছুটোছুটি তো কম হয়নি। আবার আজ রাত্রেই ট্রেন। কিন্তু শুয়ে-শুয়ে ঘুম এলো না, কিসের যেন অস্বস্তি বোধ করলেন মনের মধ্যে। একটু পরে উঠলেন, বাক্স থেকে টাকা বের ক'রে নেমে এলেন রাস্তায়। কাছেই দোকান, কিন্তু সেই নানারঙের মেয়েলি রাংতা অনেক খুঁজে তবে পাওয়া গেলো। চকোলেট কিনলেন, ছোট্ট এক শিশি সেণ্ট কিনলেন, তারপর চিন্তা করলেন একটু। টাকা ফুরিয়ে এসেছে—টিকিট কিনে মাত্রই কুড়িটি টাকা হাতে আছে। সুরেশ ঠিকই বলেছিলো—বড্ড খরচ হ'য়ে গেছে বাস্-ভাড়ায় আর টাঙ্গা-ভাড়ায়। যাকগে, অদল-বদল তো নেই, আর কোনো-রকমে হাওড়ায় পৌঁছতে পারলেই হ'লো—না-হয় বাস্-এ ক'রেই বাড়ি চ'লে যাবেন। লালে-সবুজে মেশানো একটি নকল পাথরের মালার উপর চোখ পড়েছিলো তাঁর—পাঁচ টাকা দিয়ে কিনলেন সেটি। একটু লজ্জা করলো, কাগজে বাঁধা পুঁটলিটা হাতে ক'রে পা টিপে-টিপে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন।

বাইরের ঘরে পা দিতেই সুমিত্রার মুখোমুখি প'ড়ে গেলেন এবার। মাথার কাপড় টেনে সুমিত্রা বললো, 'আপনি আবার বেরিয়েছিলেন? লিলি বললো অনেকক্ষণ এসেছেন।'

‘এই ঘুরে এলাম একটু।’

‘আমাকে ডাকলেই হ’তো। আমি তো—’

‘না, না, কোনো দরকার ছিলো না। আর তাছাড়া—’ লিলির কথাটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন ভূপেশবাবু, বললেন, ‘আমি আজই যাচ্ছি।’

‘আজই ?’

‘তোমাকে বলেছিলুম তো আগে।’

‘আর দুটো দিন থেকে গেলে হ’তো না ? এ-ক’দিন তো তাড়াহুড়োতেই কাটলো।’

‘না:, আর সময় হবে না। ওদিকে আবার অনেক হাঙ্গামা রেখে এসেছি—মামলা চলছে বাড়িওলার সঙ্গে—’

‘অন্তত কালকের দিনটা—’

‘মা, মা, সেই মঞ্জুলার সঙ্গে কথা ছিলো না—’ বলতে-বলতে লিলি ছুটে এলো ঘরের মধ্যে, দাদুকে দেখে লজ্জা পেয়ে মা-র পিছনে লুকোলো।

‘কী ? কী কথা ছিলো ?’ ভূপেশবাবু ঘাড় বেঁকিয়ে তাকালেন লিলির দিকে। ‘কথা বলছে না ? ব্যাপার কী ?’

‘কী আবার !’ জবাব দিলো সুমিত্রা। ‘এই সিনেমা-টিনেমা কিছু হবে আরকি। আজ থাক, লিলি। আরেক দিন।’

‘না, মা, ওকে আমি বলেছিলাম—’ নিচু গলায় গুনগুন করলো লিলি।

‘আজ তোমার দাদু চ’লে যাচ্ছেন, আজ বাড়ি থাকো।’

‘না, না, তাতে কী। ও যেখানে যেতে চায় যাক না। বা: !’

‘আপনি আজ যাচ্ছেন ? আমি জানতুম না।’ লিলি এক পলক দাদুর দিকে তাকালো।

‘কী আশ্চর্য ! তার জন্যে কী হয়েছে। আমি তো এই খানিক

পরেই—সুমিত্রা, ভজুয়াকে বলো না আমার বিছানাটা—' হঠাৎ থামলেন, লিলির চোখে চোখ ফেলে বললেন, 'ছাখো তো এটাতে কী আছে।'

লিলি ঠিক বুঝতে না-পেরে তাকিয়ে থাকলো।

ভূপেশবাবু নিজেই উঠলেন, সেই কাগজে বাঁধা পুঁটলিটা লিলির হাতে দিতে গিয়ে লাল হলেন একটু, তারপর সুমিত্রার দিকে ফিরে তক্ষুনি আবার বললেন, 'আটটা দশে গাড়ি। একটু আগেই বেরোবো। আমি তাহ'লে বাক্সটা গুছিয়ে ফেলিগে, একটা ধুতি আজ ছেড়ে দিয়েছিলাম, সেটা কি—' ভূপেশবাবু ব্যস্ত হ'য়ে চ'লে গেলেন সেখান থেকে, সুমিত্রাকেও ব্যস্ত ক'রে তুল'লেন। সন্ধে না-হ'তেই খেয়ে নিলেন তিনি—ভালো ক'রে খেতেও পারলেন না—সুমিত্রা টিফিন-কেরিয়ারের বাটি ভ'রে-ভ'রে সাজিয়ে দিলো পরোটা আর শামিকাবাব, চাটনি আর ছোলার ডাল—ছ-টা না-বাজতেই ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন টঙ্গার জন্য, সেই গরম কোটের উপর ঝুলমিওলা মাফলার, আর মাফলারের উপর আলোয়ান জড়িয়ে পাইচারি করতে লাগলেন ঘরে-ঘরে। কতবার যে জিনিশ দেখলেন ঠিক আছে কিনা, কতবার যে বাক্স খুলে উঁকি দিলেন কোনো কিছু ভুলে গেছেন কিনা। আর কোটের বুক-পকেটটা—যেখানে মনিব্যাগ ইত্যাদি দরকারি জিনিশ থাকে—সেটাও চাপড়ে-চাপড়ে দেখতে লাগলেন বার-বার। শেষটায় সময় হ'লো।

বাড়ির তিনজন মানুষ তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে নিচে নেমে এলো। ভজুয়া স্টেশনে যাবে, মালপত্র তুলে দিয়ে একটু দূরে সে দাঁড়িয়ে আছে। 'আচ্ছা দেবু, সুমিত্রা,—' ভূপেশবাবু বিদায় নিলেন—'মাঝে-মাঝে চিঠিপত্র তো লিখলে পারো তোমরা—এই কেমন থাকো-টাকো আরকি—দিদি, চলি তাহ'লে—' লিলি মা-র পিছন-পিছন এগিয়ে এসে প্রণাম করলো—'একবার এসো না কলকাতায় মাকে বাবাকে নিয়ে—এসো একবার—

কেমন ?' টাঙ্গার দিকে পা বাড়ালেন তিনি, হঠাৎ ফিরে এসে সুমিত্রার কানে-কানে বললেন, 'বেশি দেরি কোরো না—বুঝেছো ? ষোলো বছর হ'লো—এটাই ঠিক বয়স, এটাই ঠিক বয়স।'—ব'লেই টাঙ্গায় উঠে পড়লেন, চাকার শব্দ হ'লো।...

সেই রাত্রে বিছানায় শুয়ে দেবব্রত বললো, 'আমার বাবা কী-রকম অদ্ভুত মানুষ! কিছুতেই তাঁকে বিশ্বাস করানো গেলো না যে লিলির বয়স ষোলো নয়—তেরো।'

'দেখতে তো বড়ো দেখায় ওকে।'

'বাঃ! উনি কি আমাদের সে-রকম ভাবেন যারা মেয়ের বয়স কমিয়ে বলে!'

'ছি! তা কেন ভাববেন।'

'কিন্তু কী-রকম বললেন বার-বার!'

'বোধহয় অন্য কোনো কারণ আছে,' ব'লে সুমিত্রা লেপের তলায় পাশ ফিরলো।

* * * *

ভুপেশবাবুও পাশ ফিরলেন তাঁর বিছানায়। ঠিক বিছানা বলা যায় না; ইণ্টার ক্লাশের দেড় হাত চওড়া বাঙ্কে পাৎলা তোশকের উপর সুজনি পেতে শুয়েছেন কোটের উপর আলোয়ান আর আলোয়ানের উপর কম্বল মুড়ি দিয়ে। ঐটুকু জায়গার মধ্যে, আর অত আবরণের ভার নিয়ে, পাশ ফেরাও সহজ নয়, কিন্তু ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে হাওয়া আসছে ছুরির মতো, আর অনেকক্ষণ কুঁকড়ে থাকার পর আড়মোড়াও ভাঙতে হয় এক-আধবার। গাড়ি চলেছে ঊর্ধ্বশ্বাসে রাতের বুক চিরে, কামরাটা ঘুমে বোঝাই, মুড়ি-দেওয়া মানুষগুলো, বাঁধাছাঁদা জিনিশগুলো,

সব কেমন অবাস্তব দেখাচ্ছে হলদে ফ্যাকাশে ইলেকট্রিক আলোয়। একবার তাকিয়েই আবার চোখ বুজলেন ভুপেশবাবু। এখনো তিনি ঘুমোননি, কিংবা যদি-বা ঘুমিয়েছেন, সে-ঘুম ভেঙে গেছে বার-বার; ঠিক যেন ঘুম নয়, যেন জেগে-জেগে আচ্ছন্ন হ'য়ে প'ড়ে থাকা, যেন ঘুমের ভাঁজে-ভাঁজে কী-একটা কথা লুকিয়ে আছে, তিনি ডুবে গেলেই খোঁচা দেয় সেটা, আর তখনই তিনি চমকে ওঠেন। স্বাস্থ্য ভালো ভুপেশবাবুর; ট্রেনে স্টীমারে যেখানে হোক কোনোরকমে একটু শোবার জায়গা পেলেই গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েন, কিন্তু আজ তার ব্যতিক্রম হ'লো। ঘুমোননি তা নয়, কিন্তু আবোলতাবোল কত কী স্বপ্ন—স্বপ্ন? – ভুপেশবাবু স্তব্ধ হ'য়ে থাকলেন একটু, যেন একটা আবিষ্কারের প্রান্তে এসে থমকালেন। একটু চেষ্টা ক'রে—বাঙ্কে শুয়ে নড়াচড়া সহজ নয়—বুক-পকেটে দু-আঙুল ঢুকিয়ে টেনে বের করলেন—একটা ছবি। ফোটোগ্রাফ। আসবার আগে চেয়ে এনেছিলেন এটা সুমিত্রার কাছে। আবার নাম লিখে দিয়েছে—লিলি। লিলি? কে সে?

ভুপেশবাবু মন দিয়ে একটু দেখলেন ছবিটা, যেমন আগে আরো কয়েকবার দেখেছেন। এবার চোখ বুজতেই ঘুম এলো তাঁর। কিন্তু একেবারে কালো হ'য়ে নামলো না, এক টানে অচেতনের অন্ধকারে তলিয়ে নিয়ে গেলো না তাঁকে। অন্ধকার তো নয়, যেন মেঘ-ছেঁড়া আলো আঙুল দেখিয়ে-দেখিয়ে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাঁকে—যেন একটা অনেকদিনের পুরোনো, ভারি, অনড় কুয়াশা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে যাচ্ছে এই গাড়ির দোলায়, চাকার শব্দে। এ কোথায় এলেন? বেড়ার ঘর, অদ্ভুত গন্ধে ভরা ঘর, প্রদীপের কাঁপা-কাঁপা আলোয় অদ্ভুত ছায়ায় ভরা ঘর। শীত, বেড়ার ফাঁকে-ফাঁকে হাওয়া আসছে—কিন্তু না, শীত না, শীত নেই, এই তাপ আসে কোথা থেকে, রাত ক'রে এই রোদের তাপ, রাত ভ'রে

এই মাটির তাপ, কোনো নির্জন নদীর পাড়ে সারাদিন রোদ্দুরের পর সন্ধেবেলার নরম, নরম মাটি যেন। কোথা থেকে আসে? .... মুহূর্তের জন্য অন্ধকার হ'য়ে গেলো সব, আর তারপর হঠাৎ একটি মুখ দেখতে পেলেন ভূপেশবাবু। ষোলো বছরের লাবণ্যে ভরা মুখ, কালো চুলের তলায় ফর্শা কপালে জ্বলজ্বল করছে সিঁদুরের ফোঁটা—কী শান্ত, তার ছোট্ট তাপটুকু বিলিয়ে দেবার সব পরিশ্রম শেষ করার পর কী শান্ত এখন! ফুল, ফুল—এত ফুল কেন, ঢেকে দিচ্ছে কেন ফুল দিয়ে—আর ঐ কুৎসিত আওয়াজটা, শকুন-বাচ্চার কান্নার মতো, ঐ আওয়াজ-করা জঘন্য মাংসপিণ্ডটাকে কে নিয়ে এলো এখানে? ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হাত রাখলেন ফর্শা কপালটিতে, কিন্তু ছোঁয়ামাত্র সারা শরীরে শিউরে উঠলেন—ঠাণ্ডা, কী শীত, কী হাওয়া এই বাঙ্কে শুয়ে ঘুলঘুলি দিয়ে! ঘুমের মধ্যে কঁকিয়ে উঠলেন একবার। গাড়ি চললো, রাত আরো ঘন হ'লো, এঞ্জিনের তেজ আরো বাড়লো, যেন ঝাঁকুনিতে দুলতে-দুলতে কুয়াশার মধ্যে রোদের আঙুল আবার জ্ব'লে উঠলো আস্তে-আস্তে, ভূপেশ-বাবুর ঘুমোনো মুখে একটি হাসি ফুটলো। না, শীত আর নেই, ছোট্ট তাপ লুকিয়ে রেখেছেন বুকের কাছে, বুকের মধ্যে—কী সেটা জানেন না, জানতেও চান না আর—কিন্তু সারা রাত চলন্ত ট্রেনের ঘুমের মধ্যে সেই তাপ ঘিরে থাকলো তাঁকে, রাত ভ'রে একটি ফোঁটা রোদের তাপ, অনেক দিনের মধ্যে পুরোনো একটা হারিয়ে-যাওয়া হৃৎপিণ্ড যেন অবিরাম স্পন্দিত হ'তে লাগলো, রাত ভ'রে, মুহূর্তের পর মুহূর্ত, ঘুমের মধ্যে।

নতুনদেশ

সাসারাম স্টেশনে ভোর হ'লো। সারা রাত গভীর ঘুমের পরে জেগে উঠে গেব্রিএল গগনবরন বনার্জি ফর্স্ট ক্লাস কুপের জানালা দিয়ে তন্দ্রালস চোখে বাইরে তাকালেন। সকালবেলাটি উজ্জ্বল, সবুজ, স্বচ্ছ। মাঠে ঝরছে সোনা-রঙের রোদ্দুর, হাওয়ায় লেগেছে সবুজের আভা। দু-মিনিট পরেই ছেড়ে যাবে—তাই বোধহয় সুতীক্ষ্ম সুন্দর লাগলো বনার্জির চোখে। পুবমুখো ট্রেনে তিনি আরোহী আজ প্রায় পঁচিশ বছর পরে। ছেলে-বেলায় দু-একবার কলকাতায় এসেছিলেন বাবার সঙ্গে, স্বপ্নের মতো মনে পড়ে। তারপর দিল্লি, শিমলা, লাহোর, রাওলপিণ্ডি; ছুটি পেলে কাশ্মির বম্বাই, বাঙ্গালোর,—একবার এলাহাবাদে এসেছিলেন, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এর পর থেকে যে-রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাবে এ তাঁর পক্ষে একেবারে নতুন, বিদেশের মতো। গাড়ি চলতে লাগলো, বনার্জি ব'সে-ব'সে দেখতে লাগলেন।

ডিহরি-অন-শোনে তাঁর বেয়ারা এলো কামরায়, বের ক'রে দিলে কাপড়চোপড়, মুখ ধোবার সরঞ্জাম। দশ মিনিটে নাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। নীল সিল্কের রাত-কাপড় ছেড়ে হালকা রঙের 'আমেরিকান' খাকির প্যাণ্ট পরেছেন—দিল্লির দরবারি পাড়ায় এইটেই ফ্যাশন হয়েছে এই গ্রীষ্মে—হাত-কাটা ফিকে-হলদে শার্ট—এইটুকু সময়ের মধ্যে দাঁত মেজে দাড়ি কামিয়ে একবারে ফিটফাট। পাৎলা ব্রাউন রঙের চুল, কিন্তু এমন ক'রে ফাঁপিয়ে দিয়ে ব্যাকব্রাশ-করা যে তার 'বিরলতা চট ক'রে ঠাহর হয় না। পাছে উঠে যায়, এই ভয়ে তিনি আজ বারো বছর হ'তে চললো স্নানের সময় মাথা ভেজান না, বে-রম্ ছাড়া কিছু ছোঁওয়ান না চুলে—কিন্তু তবু নির্ভুল নিয়মে একটু-একটু ক'রে চুল উঠে যাচ্ছে, প্রতি বছর আরো একটু চওড়া হচ্ছে কপাল। কিছুতেই ঠেকানো যাচ্ছে না—শেষ পর্যন্ত সেই বাবার মতোই হবে আরকি।

বেয়ারাকে কামরায় বসিয়ে বনার্জি রেস্তোরাঁ-কারে গিয়ে ঢুকলেন। জানলার ধারে একটি চেয়ারে বসবার সঙ্গে-সঙ্গেই গাড়ি স্টেশন ছেড়ে আস্তে প্রকাণ্ড পুল পার হ'তে লাগলো। গগনবরন নিচে তাকিয়ে দেখলেন, উঁচু-নিচু হলদে বালু সোনা-জ্বলা আকাশের তলায় বুক পেতে প'ড়ে আছে—কোথাও একটু কালো, কোথাও বা কোঁকড়া, আর কোথাও এমন মসৃণ যে চোখ দিয়েই সেই কোমলতা স্পর্শ করা যায়—আর ফাঁকে-ফাঁকে এখানে-ওখানে ব'য়ে চলেছে ঝিরিঝিরি ঝিকিমিকি রুপোলি জল। যতক্ষণ দেখা যায়, গগনববন দেখলেন, তারপর এক পট চা নিয়ে বসলেন স্থির হ'য়ে। একটু পরেই গাড়ি বিহারে ঢুকবে, তাবপব বাংলা। মনে পড়লো তাঁর অধীনস্থ বাঙালি বাবুদেব ছুটির জন্য আকুলি-বিকুলি। ছুটি পেলেই দেশের দিকে দৌড়। ঘরমুখো বাঙালি! এ জন্যেই কিছু হ'লো না! গবর্মেণ্টেব বড়ো-বড়ো ব্যাপারে মান্দ্রাজি-পাঞ্জাবিবা এগিয়ে যাচ্ছে হু-হু ক'রে। ঠাকুরদা যদি খ্রিস্টান হ'য়ে দেশত্যাগী না হ'তেন, বাবা যদি বড়োলাটের দফতরে ঠাকুরদার জায়গাটি নিতে না-পাবতেন, তাহ'লে গগনবরনেরই বা কী দশা হ'তো! ধুতির সঙ্গে শার্ট-পরা তেল-চোঁওযানো বাঙালি বাবু—ভাবতে হাসি পেলো বনার্জির। জীবনে একখানা ধুতি পরেননি তিনি, বাংলা অক্ষর চেনেন না, কথাবার্তাটা বোঝেন, চেষ্টা করলে বলতেও পারেন এক-আধটু। পিতামহী ইংরেজি জানতেন না, নিজের ঘরে ব'সে ঠাকুর-পুজোও করতেন, কিন্তু অল্প বয়সেই মারা যান তিনি, তাঁকে গগনবরনের ভাল মনে পড়ে না। আট-দশ বছর বয়স থেকে বাড়িতে ইংরেজি ছাড়া কথা শোনেননি, ঠাকুরদার সঙ্গে বাবার যে-কথাবার্তা হ'তো, তাও ইংরেজিতে। যে-সব সাহেবি স্কুলে পড়েছেন সেখানে নিতান্ত দয়া ক'রে একটি দুটি দিশি ছেলেকে নেয়া হয়—খ্রিস্টান হ'লেও গ্রাহ্য করে না তারা—এর জন্য বাবাকে যত তদবির

করতে হয়েছে, তার চাকরির জন্য সে-তুলনায় কিছুই করতে হয়নি। সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ ক'রে দু-বছর বিলেত; তারপর অতি সহজেই লাটের দপ্তরে ঢুকে পড়েছিলেন—কুড়ি বছরে আজ যেখানে এসে পৌঁচেছেন ঠাকুরদা কি বাবা তা কল্পনাও করতে পারতেন না। আজ দিল্লি-শিমলায় রীতিমতো রাজত্ব করেন তিনি। বিশেষ একটি জরুরি কাজ নিয়ে ভারত-গবর্মেণ্টের প্রতিনিধি হ'য়ে চলেছেন বাংলা গবর্মেণ্টের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে। তিনি আসতে চাননি, শুনেছেন এ-সময়ে কলকাতায় বিশ্রী স্যাঁৎসেঁতে গরম—কিন্তু কাজটি এতই দায়িত্বপুর্ণ যে অন্য কাউকে ঠিক বিশ্বাস করাই গেলো না। দিন তিন-চার থাকতে হবে, তার পরেই ফিরতি ট্রেন, সপ্তাহখানেক দিল্লিতে কাটিয়ে আবার শিমলা। ভালোই লাগে বাড়ি ফিরতে।

কোনো-একটা স্টেশন থেকে মা-কে টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে—তিনি এমন করেন যেন গেব্রিএল এখনো ছেলেমানুষ। বেরোবার আগে সাত বার ক্রুশের চিহ্ন এঁকে দিয়েছেন বুকে। গোঁড়া রোমান ক্যাথলিক তিনি, গলা থেকে ছোট্ট সোনার ক্রুশটি কখনো নামান না, ঘর ভরা তাঁর মেরি মাদলীন, টেরেসা, উরসুলার ছবি, সকালে সন্ধ্যায় মালা জপেন, পাঁজি দেখে-দেখে উপোশ করেন, মাছের বদলে মাংস কিংবা মাংসের বদলে মাছ খান। তাঁর এ-সব বাড়াবাড়ি দেখে সকলেই হাসে, তিনি অবিচলিত। মা-র বাবা রেভারেণ্ড মুখার্জি তাঁর বাবার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে দুর্দান্ত খৃস্টান হন—দিল্লি মিরাট অঞ্চলে বহু লোককে খৃস্টান বানিয়ে ছেড়েছেন তিনি—মেয়েকে ছেলেবেলা থেকে রেখেছিলেন কনভেণ্টে, সেখানে হোলি বাইবেল আর সেইণ্টদের জীবনী প'ড়ে-প'ড়ে গগনবরনের মা বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে যে-ধারণা করেছিলেন, এখনো তার কোনো বদল হয়নি। এই যে গেব্রিএল কলকাতায় চলছে, এ-যাত্রায় সকল অমঙ্গল থেকে তাকে রক্ষা করবার জন্য মা কি অন্তত চারজন সেইণ্টকে নিযুক্ত ক'রে না

দিয়েছেন। মা-র কথা ভেবে হাসি পেলো গগনবরনের, কেমন স্নেহও হ'লো। ছেলেকে বিয়ে করতে ব'লে-ব'লে হয়রান হলেন তিনি : জানেন না ছেলে যে এত যোগ্য হ'য়েও উনচল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত বিয়ে না ক'রে আছে, তিনিই তার কারণ। মা-কে গেব্রিএল খুবই ভালোবাসে, কোনো কষ্ট দিতে চায় না তাঁর মনে, অথচ তাঁর পছন্দমতো একটি বাইবেল-বিশ্বাসী অতি নির্দোষ কুমারীকে বিয়ে করাও তার পক্ষে অসম্ভব। যে-সব মেয়েদের তার ভালো লাগে—আর যাদের জন্য তাঁর বিয়ে না-ক'রেও তেমন অসুবিধে হচ্ছে না—তারা কথায়-কথায় আত্মার নরকবাস-সম্পর্কিত ছোট্ট অথচ জোরালো শপথ-বুলি উচ্চারণ করে—তাদের মুখের একটি কথা শুনলে মা সেই যে মূর্ছিত হ'য়ে পড়বেন, সে-মূর্ছা আর হয়তো ভাঙবেই না। অতএব বিয়ে এখন থাক।

বনার্জি সিগারেট ধরিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন। বেগে গাড়ি ছুটেছে মাঠের পর মাঠ পার হ'য়ে। এই আকাশ-ছোঁওয়া খোলা মাঠের মধ্যে একটা তীব্রতা দেখতে পেলেন তিনি। শিমলার উঁচুতে-নিচুতে আড়ালে-আবডালে আপেল-পাইনের আঁকবাঁকা আলো-ছায়ায় যে-আশ্রয়, যে-নিশ্চয়তা আছে, সবুজ-নীল-গেরুয়াব ঢেউ-তোলা এই অঢেল প্রান্তরে তার কিছুই নেই ; এখানেও মানুষ ঘর বাঁধে, কিন্তু ঘর তাদের বাঁধে না, তাদের মন ঘুবে বেড়ায় বিনা ঠিকানায় মাঠের মধ্যে হাওয়া হ'য়ে। অনেকদিন আগেকার শোনা একটা গানের সুর বনার্জির মনে হঠাৎ ফিরে এলো। কী না বলে তাকে? হ্যাঁ—বাউল, বাউল গান। আবছা মনে পড়লো, সে-সুরে মন যেন ঘর ছেড়ে কোথায় চ'লে যেতে যায়—সে-সুর এই মাঠের। ভালো নয়—ওতে মানুষকে অকেজো ক'রে দেয়, তার উচ্চাশা হরণ করে, উদ্যম নষ্ট করে। ঢের ভালো জ্যাজ বাজনা, চীৎকারটা একটু বেশি, কিন্তু সারাদিনের খাটুনির পরে ঐ রকম তেজস্কর পদার্থই

কিছু দরকার—রক্ত গরম করে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উৎসাহ আনে, পরের দিনের কাজের জন্য মনের ধনুকে ছিলা পরিয়ে দেয়।

গয়াতে নেমে মা-কে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে বনাজি কামরায় ফিরে এলেন। বেয়ারা ততক্ষণে তাঁর স্নানের সরঞ্জাম সাজিয়ে রেখেছে বাথরুমে—স্নান সেরে, পাইপ ধরিয়ে বসলেন ডিটেক্টিভ নভেল নিয়ে। বেলা বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে গরম হচ্ছে, ধুলো উড়ছে, জালের জানলাটা তুলে দেবেন কিনা ভাবলেন—কিন্তু বাইরের দৃশ্যস্রোত বন্ধ হ'বে ভাবতে খারাপ লাগলো। থাক। ছোটো-ছোটো স্টেশনগুলোকে ধুলোর ঝড়ে আবছা ক'রে দিতে-দিতে তুফান মেল হৈ-হৈ ক'রে ছুটলো, দুপুরবেলা হাজারিবাগ রোড। বনাজি লাঞ্চ খেতে রেস্তোরাঁ-কারে আর গেলেন না—এক টুকরো চিকেন আর কফি আনিয়ে কামরায় ব'সেই খেয়ে নিলেন—স্বভাবতই স্বল্পাহারী তিনি, তাছাড়া এই গরম! দু-দিন দেরি করলেই এয়ার-কণ্ডিশণ্ড গাড়ি পাওয়া যেতো, কিন্তু দেরি করবার উপায় ছিলো না।

কী গরম, সত্যি! দুটো পাখা অবিশ্রান্ত ঘুরে-ঘুরে শুধু গরম হাওয়াই ছড়াচ্ছে। কখন পৌঁছবে? বহুবার দেখা টাইমটেবিল আর-একবার দেখলেন। অনেক দেরি এখনো। বাইরে দৃশ্যের দ্রুত বদল হচ্ছে—পাহাড়, বন, উপত্যকা; এই দুপুরবেলাতেও কুয়াশার ছলছলানি, হঠাৎ যেন চারদিক ঘিরে আসে পাহাড়ে, আবার দিগন্ত খুলে যায়। অনেককে বলতে শুনেছেন ছোটোনাগপুর ভারতবর্ষের বিউটি-স্পট। তা—মন্দ কী, ভালোই তো দেখতে। হিমালয়ের বড়ো-বড়ো তুষার-শ্রেণী দেখে আসছেন ছেলেবেলা থেকে—পাহাড়ের এই রূপটি নতুন লাগলো। এ যেন পাহাড় হ'য়েও তরল আর চঞ্চল—এতে কেবলই কথা, কেবলই ভঙ্গি, কেবলই নৃত্য। ওরই মধ্যে স্তব্ধ গম্ভীর ছায়া ফেললো নীল পরেশনাথ, অনেক-ক্ষণ ধ'রে চললো ট্রেনের সঙ্গে-সঙ্গে, তারপরেও দিগন্তে ঝাপসা হ'য়ে

রইলো। প্রায় দু-ঘণ্টা ধ'রে চললো এই পাহাড়ের খেলা, তারপর আস্তে-আস্তে এগিয়ে এলো সমতল—পাহাড়ের শেষ রেশ প্রান্তরের দীর্ঘশ্বাসে মিলিয়ে গেলো। গাড়ি ঢুকলো বাংলায়—সবুজ আর গেরুয়া মাটিতে নক্সা-বোনা ধানবাদ স্টেশনে।

ততক্ষণে বিকেল। কিন্তু সূর্য যত নামছে, গরমও ততই বেড়ে উঠছে; ছোট্ট কামরার মধ্যে এখন অসহ্য। বনার্জি হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে এতক্ষণ ব'সে থেকে-থেকে তিনি ক্লান্ত হয়েছেন। জালের জানলাগুলি তুলে দিয়ে শুয়ে পড়লেন লম্বা হ'য়ে, একটু পরেই তন্দ্রা এলো।

জেগে উঠে মনে হ'লো, কামরায় বড়ো বেশি অন্ধকার। ট্রেন চলছে না, বাইরে কলরব শোনা যাচ্ছে। কোন স্টেশন? জাল তুলে দিয়ে বাইরে তাকালেন: প্ল্যাটফর্মে লোকজন, চ্যাঁচামেচি, ছুটোছুটি অন্য সব স্টেশনের চাইতে বেশি। 'চা—ই মিহিদানা, সীতাভোগ! সীতাভোগ, মিহিদানা!' ও, বর্ধমান—বর্ধমান এসে গেছে। হাতের ঘড়িতে দেখলেন পাঁচটা, কিন্তু অন্ধকার, যেন সন্ধ্যার মতো। আকাশ-ভরা মেঘ—কালো, ঘোর কালো। বনার্জি একটু অবাক হলেন। মনে হ'লো এক জগতে ঘুমিয়ে জেগে উঠেছেন আর-এক জগতে। ছিলো দারুণ রোদ, ছিলো চোখ-ঝলসানো ধাতুর মতো আকাশ—কোথায় ছিলো এই মেঘ, কেমন ক'রে পৃথিবীর চেহারা বদলে দিলো।

'চা, সাব?'

বনার্জি সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লেন। কিন্তু চা-টা অনেকক্ষণ অস্পৃষ্ট প'ড়ে রইলো। আকাশে মেঘ ফুলছে, কেঁপে উঠছে, গোল হ'য়ে গড়াচ্ছে, ধোঁয়া হ'য়ে ছড়াচ্ছে। তারপর মেঘ নামলো পৃথিবীতে, বেগে বৃষ্টি এলো। বনার্জির ভালো লাগলো না, মনে হ'লো তাঁর চেনা পৃথিবীটাই যেন-হারিয়ে গেলো হঠাৎ, কোথায় যেন বিশ্বের শৃঙ্খলা নষ্ট হ'লো। মুহূর্তের

জন্য কেমন নিঃসঙ্গ, নিঃসহায় মনে হ'লো নিজেকে। কিন্তু বাইরে লোকেদের খুব ফুর্তি; চীৎকার ক'রে কথা বলছে পরস্পরের সঙ্গে; প্ল্যাটফর্মের যে-অংশে ছাদ নেই, সেখানে কয়েকটা লোক দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভিজছে। ঢোলা নীল পাজামা শপশপ করতে-করতে ভিজে খোলা গায়ে একটা লোক আস্তে-আস্তে এঞ্জিনের দিকে চ'লে গেলো—দেখে মনে হয় স্টোকার। গাড়িটা এখানে যেন অন্য সব স্টেশনের চাইতে বেশি দাঁড়াচ্ছে—কী করছে এতক্ষণ?

যেন বনার্জির বিরক্তির ভাবটা বুঝতে পেরেই একটু পরে গাড়ি আবার রওনা হ'লো। কিন্তু আগের মতো বেগ তার আর নেই—বাংলা-দেশে এসেই সে অলস হ'য়ে পড়েছে। বনার্জি শুনেছিলেন যে বাংলার নরম মাটিতে গাড়ি বেশি স্পীড নিতে পারে না। এখানে সবই ধীর, সবই শ্লথ, সবই মৃদু—যত বেগ ঐ মেঘের, আর যত তেজ মানুষের গলায়। বর্ধমান স্টেশনটায় কী চ্যাচামেচি—কেউ আস্তে কথা বলবে না—কিচির-মিচির, কিচির-মিচির!– কিপলিং যে বাঙালিকে বাঁদর বলেছিলেন, কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয়।

বনার্জি চা ঢেলে আস্তে-আস্তে খেতে লাগলেন। বৃষ্টির ছাঁট আসছে কামরায়, কাচ তুলে না-দিয়ে একটু স'রে বসলেন। বাইরে সমস্তটাই ঝাপসা, ছোটো-ছোটো ঘন গাছপালা যেন গায়ে গা ঠেকিয়ে চুপচাপ ভিজছে—এদের স্বভাবে প্রতিবাদ নেই, বিদ্রোহ নেই, এরা জানে না পাইনের মতো মাথা উঁচু করতে, উদ্ধত হ'তে, নম্র এরা, নির্জীব, যেমন মানুষ, তেমনি গাছপালা। এই নির্জীবতার সুরে সুর মিলিয়ে গাড়ি চলছে টিকশ-টিকশ ক'রে—এত আস্তে যে, যে-স্টেশনে দাঁড়াচ্ছে না, তার নামটা পর্যন্ত চেষ্টা করলে পড়া যায়। বনার্জি অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠলেন, মনে হ'লো ট্রেনটাকে ধমক দিয়ে চেতিয়ে তোলেন। পাইপে

তামাক ভরতে-ভরতে ভাবলেন, যে-দেশে এ-রকম বৃষ্টি হয় সে-দেশের লোক কাজকর্ম করে কেমন ক'রে? আকাশের দিকে তাকিয়ে কবিতা-টবিতা লেখা—তাদের দৌড় ঐ পর্যন্তই। টেগোরের দু-একখানা ইংরেজি বই তিনি পড়েছেন—কী হয় ও-সব বই দিয়ে, তাতে কি রেলগাড়িতে সময় কাটে? আর রেলগাড়িতে চড়তে না-হ'লে, বা একটু ফ্লু হ'য়ে শুয়ে থাকতে না-হ'লে, বয়স্ক মানুষের বই পড়বার সময়ই বা কোথায়? গগনবরন তাঁর ভ্রমণসঙ্গী অগথা ক্রীস্টিখানা খুললেন, কিন্তু পড়া হ'লো না, নিজের অনিচ্ছাতেও চোখ গেলো বাইরে। বৃষ্টির বেগ ক'মে এসেছে, ফুটে উঠেছে পরিষ্কার হ'য়ে বাইরের ছবি। আম জাম কাঁঠালের ঠেলা-ঠেলি; সারি-সারি কলাগাছ, আঙুলের মতো সরু-সরু বাঁশবন, পুকুর, ডোবা, সাপের ফণার মতো কচুরিপানা, কচুরিপানার শৌখিন ফুল, মাটির বাড়ি, বাঁশের বেড়া, মাঝে-মাঝে দু-একটি জীর্ণ পুরোনো পাকা বাড়ি, এক-ফেরতা কাপড় প'রে মেয়েরা ঘাট থেকে জল নিচ্ছে, কাদা-মাখা উলঙ্গ শিশু পাড়ে দাঁড়িয়ে। সমস্তটা কেমন অদ্ভুত ঠেকলো বনাজির চোখে। এ-সবই তাঁর কাছে অত্যন্ত নতুন, বিদেশে প্রথম আসার উত্তেজনা অনুভব করলেন—অথচ যেন নতুন নয়, সবই তাঁর জানা, যেন স্বপ্নে এ-সব দেখেছেন রাতের পর রাত, তাই এখন দেখে আর অবাক লাগছে না। বৃষ্টি-ধোয়া মাটির একটা ভিজে-ভিজে গন্ধ উঠলো হাওয়ায়: ভালো লাগলো না, পকেট থেকে ভবিমার গন্ধ-মাখা রুমাল বের ক'রে নাকে চেপে ধরলনে, কিন্তু হাওয়ার ঝলকে-ঝলকে সেই অস্বাস্থ্যকর স্যাঁৎসেঁতে গন্ধ নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গী হ'য়ে মগজটাকে যেন আচ্ছন্ন ক'রে দিলে।

বৃষ্টি থামলো, কিন্তু মেঘ সরলো না, ছায়াচ্ছন্ন দুর্বল দিনান্ত রাত্রির রাজত্ব স্বীকার ক'রে নিয়ে অলক্ষিতে লুপ্ত হ'য়ে গেলো। শিমলেতে দিন শেস হ'য়েও হয় না; আকাশের রেখায়, পাহাড়ের চুড়োয় কোঁটা-কোঁটা

আলো চিকচিক করে অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ চলে দিন আর রাত্রির যুদ্ধ, তবে তো দিন হার মানে। আর এখানে—মেঘের আড়াল থেকে কখন রাত্রি এসে দিনটিকে লুঠ ক'রে নিয়ে গেলো যেন। এরই মধ্যে অন্ধকার! বাইরে তাকিয়ে মনে হয়, এখানে পৃথিবীর রেখা নেই, রূপ নেই, ভঙ্গি নেই, গাছপালা, মাটি, মানুষ সমস্তটাতেই জলের অংশ যেন অত্যন্ত বেশি, সবই অস্থিহীন, অর্ধ-তরল, আর্দ্র, অস্পষ্ট। অন্ধকারটাও কেমন ভিজে-ভিজে, একটা পচা জলের গন্ধ বেরুচ্ছে তার গা থেকে—সংহতি নেই, কাঠিন্য নেই, প্রতিরোধ নেই, এ-অন্ধকার জোনাকির ঝকঝকে সবুজে কম্পিত, এঞ্জিন-চ্যুত কয়লার জ্বলন্ত-লালে বিদীর্ণ। অত্যন্ত খারাপ লাগলো গগনবরনের, রীতিমতো মন-খারাপ হ'য়ে গেলো। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, পূর্বপুরুষ বাংলা দেশ ছেড়ে, বাঙালি সমাজ ছেড়ে চ'লে এসেছিলেন—নয়তো আজ তাঁর কী উপায় হ'তো। এতদিনে হয়তো পাঁচ-সাতটি রোগা-রোগা ছেলে-মেয়ের মোটাসোটা বাবা হ'য়ে বসতেন—তেমন বরাতজোর থাকলে দাদা-মশাই হ'তেই বা বাধা ছিলো কী।

বাইরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে গগনবরন কামরার সব কটি আলো জ্বেলে দিলেন—তারপর পোর্টফোলিও খুলে সরকারি কাগজপত্র বের ক'রে যে-কাজে চলেছেন, তারই একটা খশড়া তৈরি করতে লাগলেন মনে-মনে। তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করতে তিনি পারবেনই—তাঁর নিজের মনে কোনো সংশয় নেই। তার ফলে বাংলাদেশে একটা নতুন ট্যাক্‌শো অবশ্য বসবে, কিন্তু ভারত-সরকারের বজেটে ব্যয়ের দিকটা হালকা হবে—উত্তর-পশ্চিম সীমান্তকে সুরক্ষিত করবার জন্য আরো সৈন্য চাই, আরো সৈন্য মানেই আরো টাকা। এ-কাজটি গগনবরন যদি পরিচ্ছন্নভাবে সমাধা ক'রে উঠতে পারেন, তা'হলে এর পরে তাঁর এমন-একটি আসনে বসবার সম্ভাবনা, যে-আসন এতকাল সীনিয়র ইংরেজ সিবিলিয়ানের জন্যই নির্দিষ্ট ছিলো।

কাল এগারোটায় রাইটার্স বিল্ডিং, চারটের সময় গবর্নরের সঙ্গে…

গাড়ির গতি আরো ক'মে এসেছে—এলো নাকি হাওড়া? গগনবরন বাইরে তাকিয়ে দেখলেন দূরে আকাশে কলকাতা শহরের পিঙ্গল আভা, ঝিলিক দিচ্ছে অনেকগুলো সিগন্যালের লাল, নীল, সবুজ, ঐ উঁচুতে ছুটো একটা বৈদ্যুতিক বিজ্ঞাপন। কাগজগুলো পোর্টফোলিওতে ঢুকিয়ে, গায়ের শার্টটি বদলে, একটি ছাই রঙের স্যুটের সঙ্গে সান্ধ্য টাই প'রে নিলেন—সারাদিনের ব্যবহৃত রুমালটি ত্যাগ করে নতুন রুমাল নিলেন পকেটে, এবং পকেট থেকে ভাঁজ-করা চিরুনি বের ক'রে চুলটা ঠিক ক'রে নিলেন। এই কাজগুলিতে একটুও ব্যস্ত ভাব ছিলো না তাঁর, অথচ ক্ষিপ্রতা ছিলো। গাড়ি যখন হাওড়ার প্ল্যাটফরমে ঢুকছে তখন তিনি নিখুঁত প্রস্তুত, হাজার মাইল রেলভ্রমণের এতটুকু ছায়া নেই তাঁর মুখে। গগনবরনের গায়ের রং শ্যামল, দেহটি সুঠাম, শ্বেতাঙ্গ-বেশ ভাঁজে-ভাঁজে খাপে-খাপে মিলে থাকে—যখন যা পরেন তাইতেই ভালো দেখায়, আর কাপড়চোপড় তিনি সব সময়েই ভালো পরেন।

হাওড়া স্টেশনের কোলাহল আর হাওড়া পুলের জনস্রোত পার হ'য়ে তিনি যখন গ্রেট ঈস্টার্ন হোটেলে এসে উঠলেন, একটা শান্তির নিশ্বাস পড়লো তাঁর। মনে হ'লো অনেকক্ষণ পরে আবার স্থিত হলেন, নিশ্চিন্ত হলেন। এখানে চারদিকেই শ্বেতাঙ্গ মানুষ, কালো মানুষরাও ভালো ইংরেজি বলে—তাঁর অভ্যাস এখানে নিয়ম, তাঁর ব্যবহার এখানকার অভ্যাস। ডিনার-টেবিলে আলাপ হ'লো একটি ছোকরা ইংরেজের সঙ্গে—সে সদ্য আই. সি. এস পাশ ক'রে মাত্র দু-দিন আগে দেশ থেকে পৌঁচেছে—তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে গগনবরন ভুলেই গেলেন যে, তিনি কলকাতায় আছেন।

তার পরের দুটো দিনেও একবার সে-কথা মনে করবার তিনি সময় পেলেন না—একবার অনুভব করতে পারলেন না কলকাতার কোনো

অস্তিত্ব, নতুন দেশের কোনো আভাস। রাইটার্স বিল্ডিং থেকে গবর্মেণ্ট হাউস—এই পথটুকুতেই আবদ্ধ রইলো তাঁর চলাফেরা। দিল্লি শিমলেতে আপিশ করেন—এখানেও তাই করলেন—চোখের দেখায় অবশ্য অনেকটা তফাৎ, কিন্তু মনের মধ্যে সেই একই স্বাদ। দু-দিনেই কাজ শেষ হ'লো, বুঝলেন যে অভীষ্ট সিদ্ধ হবে, কিন্তু কোনো কাজে একটুও ফাঁক রাখা তাঁর স্বভাব নয়, ব্যাপারটায় কর্তৃপক্ষের চরম স্বাক্ষর নিয়ে তবে তিনি যাবেন। সেইজন্য আর একটা দিন থাকতে হ'লো।

সেদিন কাজ বেশি ছিলো না, বিকেলে চায়ের নিমন্ত্রণ ছিলো সোমেন চৌধুরীর বাড়িতে। রাইটার্স বিল্ডিঙের অন্যতম অধিকর্তা এই চৌধুরী, অক্সফোর্ডে বন্ধুতা ছিলো, কর্মজীবনেও দেখা হয়েছে কয়েকবার। চৌধুরী মোটা হয়েছেন, মুখের চামড়া ঝুলে পড়েছে, ঠোঁটের কোণে অক্সফোর্ডীয় বিদ্যুৎ আর চমক দেয় না। পুরোনো বন্ধুকে দেখে গোপনে মর্মাহত হলেন গগনবরন; মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলেন ঘুম থেকে উঠে মেদনাশক ডন-কসরৎ একদিনও বাদ দেবেন না।

চৌধুরীর ফ্ল্যাট থিয়েটার রোডে, হোটেল থেকে ট্যাক্সিতে যেতে-যেতে মনটা বেশ ভালোই লাগছিলো গগনবরনের। কাজটি এমন সুসম্পন্ন হয়েছে যে এতটা তিনিও আশা করেননি। ঘণ্টা দুই আগে শিমলেতে ট্রাঙ্ক-কল ক'রে কর্তৃবাচ্যে অনেক সুশ্রাব্য কথা শুনেছেন। পদোন্নতি নিশ্চিত। এদিকে মেঘ কেটে গিয়ে আজ বিকেলে রোদ্দুরটি উঠেছে বেশ, চৌরঙ্গি ঝকঝক করছে—তা কলকাতার শহর দেখতে এমন মন্দই বা কী। গগনবরন একটু অলসভাবে সিগারেটের জন্য পকেটে হাত দিলেন—হাত দিয়ে অবাক হলেন। এমন ভুল তো তাঁর কখনো হয় না। কোন পকেটে কোন জিনিশ থাকবে সে-বিষয়ে অনমনীয় নিয়ম আছে তাঁর—তবু অন্য পকেটগুলিও একবার হাৎড়ে দেখলেন। না, ভুলেই গেছেন।

কোটের উপর-পকেটে ঈষৎ-উদ্ভাসিত রঙিন রুমাল নেকটাইয়ের সঙ্গে সুর মিলিয়েছে—কিন্তু ব্যবহারের রুমাল আনতে ভুলে গেছেন। রুমাল ছাড়া এমনিতেও একদণ্ড তাঁর চলে না—আরো এখন যাচ্ছেন চায়ের নিমন্ত্রণে।

—'এই! রোখো!'

সামনেই হোয়াইটওয়ে লেডলর দোকান, কর্পোরেশন স্ট্রীটের দরজায় ট্যাক্সি দাঁড়ালো। গগনবরন সবেগে ভিতরে ঢুকে এক ডজন রুমাল কিনে বেরিয়ে আসছেন, হঠাৎ তাঁর চোখে পড়লো দরজার কাছে একটি বাঙালি মেয়ে দাঁড়িয়ে। তার সামনে কতগুলি শস্তা দরের সাবান পাউডার ইত্যাদি সাজানো—দোকানের সহকারিণীদের মধ্যে সে-ই বোধহয় সবচেয়ে শস্তা দরের। ঐ রকম জায়গায় কেমন বেখাপ্পা দেখালো মেয়েটিকে, আবার একটু অদ্ভুতরকম সুন্দরও। কালো মেয়েটি। রোগা, ছোটোখাটো, পরনে একটি সাধারণ মিলের শাড়ি, গায়ে খুব ফিকে রঙের জামা। তার পণ্যবস্তুর ক্রেতা নেই—হাত দুটি দু-পাশে সোজা ঝুলিয়ে দিয়ে কোনো-একটা অনির্দিষ্ট নির্বস্তুক লক্ষ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে মূর্তির মতো সে দাঁড়িয়ে আছে—দেখেই বোঝা যায় এ-কাজে অভ্যস্ত হ'তে সে পারেনি এখনো। দোকানের ফিরিঙ্গি মেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, কথা বলছে, কাজ করছে—তাদের উগ্র সচলতার মধ্যে এই মেয়েটির স্তব্ধতা যেন কেমন। চারদিকেই শাদা রং, চারদিকেই বিলেতি জীবনযাপনের নিদর্শন, দোকানের হাওয়ায় পর্যন্ত চেনা-চেনা বিলেতি গন্ধ; তার মধ্যে এই মেয়েটির শাড়ির রেখা আর দেহের রেখা, কালো রং আর কালো চুল আর কালো চোখ হঠাৎ যেন গগনবরনকে দাঁড় করিয়ে দিলো। যেন বললে, 'ছাখো!'; বললে, 'আমাকে চেনো না?' গগনবরন, যেন নিজে না-জেনে, এমন্-ভাবে তাকালেন যেমন ক'রে কোনো ভদ্রলোক কোনো জ্যান্ত মানুষের দিকে তাকায় না, হয়তো বা ম্যুজিয়মে ঝোলানো কোনো ছবি ছাখে।

মেয়েটির মূর্তির মতো স্তব্ধতায় মৃদু স্পন্দন এলো, চোখে পলক পড়লো একবার। একটু আড়ষ্ট ইংরেজিতে বললে, 'কী করতে পারি, স্যার, আপনার জন্য ?'

গগনবরন নীল সবুজ বেগনি রঙের বড়ো-বড়ো গোল-গোল সাবানগুলি একটু নেড়ে-চেড়ে দেখতে লাগলেন—চোখে পড়লো মেয়েটির মণিবন্ধে সরু বালা, পাৎলা হাতের পাতা দুটি, হাঁটু থেকে কাঁধ পর্যন্ত শাড়ির পাড়ের বঙ্কিত ঊর্ধ্ব রেখা ; তারপর কালো চোখে এসে তাঁর চোখ থামলো, মেয়েটি যেন নতুন ক'রে সচেতন হ'য়ে অস্পষ্ট অলক্ষ্য থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে বললে, 'সাবান নেবেন ?'

একটু সময় নিয়ে পাঁচখানা সাবান কিনে ফেললেন গগনবরন।

'আর-কিছু ?'

একটি বাথ-পাউডার নির্বাচন ক'রে গগনবরন ভাবতে লাগলেন, মেয়েটি পুর্ব প্রশ্নের পুনরুক্তি করলে কী করবেন। কিন্তু মেয়েটি ততক্ষণে ক্যাশমেমো লিখে ফেলেছে—জিনিশ গছাতে তেমন তৎপর নয় সে, হাত পেতে টাকাটা নিতেও অভ্যস্ত হয়নি। ফিরিঙ্গি মেয়েরা যেমন সূক্ষ্ম ত্রিকোণ নখযুক্ত দু-আঙুলের ফাঁকে আলগোছে নোটটি ধ'রে একটা অনতিস্ফুট 'কিউ' উচ্চারণ ক'রে গটপট করে চ'লে যায়, এ-মেয়েটি সে-রকম কিছুই করলো না, গগনবরনের হাত থেকে দশ টাকার নোটটি নিতে সংকোচের একটি ভঙ্গি ব্যাপ্ত হ'লো তার দেহে—বেয়ারার সাহায্য না-নিয়ে খুচরোটা নিজেই এনো দিলো, তারপর আবার যথাস্থানে দাঁড়ালো আগেকার মতো নিশ্চল ভঙ্গিতে। গগনবরন হঠাৎ উপলব্ধি করলেন যে এখানে তাঁর আর-কিছু করবার নেই ; কাউণ্টর থেকে ব্রাউনপেপারে জড়ানো পুঁটলি দুটি সংগ্রহ ক'রে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সিতে উঠলেন।

চৌধুরীর বাড়ির ব্যাপারটা নামে চা-পার্টি হ'লেও আসলে একটু

ভিন্ন ধরনের—সন্ধের পর থেকে যে-সব পানীয় পরিবেশিত হ'তে লাগলো, তার তেজস্করতা চায়ের চাইতে কিছুটা বেশি। ঠিক চায়ের সময়টায় শুধু বনাজিই ছিলেন অতিথি, কিন্তু সন্ধ্যা পার হ'য়ে ঘরে আলো জ্বালা হ'তে-হ'তে প্রায় কুড়ি পঁচিশ জন অতিথির সমাগমে চৌধুরীর ড্রয়িং-রুম সরগরম হ'লো। চৌধুরী মিশুক মানুষ; কলকাতার শহরে বাঙালি, অবাঙালি, শ্বেতাঙ্গ বন্ধু তাঁর অনেক, তাঁর ককটেল-মিশ্রণের নৈপুণ্যকে বন্ধুরা, বন্ধু হ'য়েও, ঈর্ষা করেন না, কৃতজ্ঞ কণ্ঠে প্রশংসা ক'রে থাকেন। গগনবরন দিল্লি-শিমলার জগতেরই একটা প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলেন এখানে। ইংরেজ মেয়েদের দেহের কোনো-কোনো অংশ অনাবৃত, আর ভারতীয় মেয়েদের দেহের কোনো- কোনো অংশ আবৃত—এইটুকু প্রভেদ ছাড়া শ্বেতাঙ্গী শ্যামাঙ্গী চেনবারই প্রায় উপায় নেই। একটি বাঙালি মেয়ে বুকের উপরে কোনোরকমে একটুখানি কাপড় সংলগ্ন ক'রে কলহাস্যের উচ্ছ্বাসে ফুলে-ফুলে উঠছিলো—গগনবরনের কেবলই ভয় হচ্ছিলো হাসির চাপে ঐ কাপড়টুকু হঠাৎ না খ'সে পড়ে—কিন্তু ভয়ই বা কিসের।

রাত ন-টা নাগাদ পার্টি রীতিমতো জ'মে উঠলো। এ-ধরনের সহস্র সন্ধ্যা ভোগ করেছন গগনবরন, কিন্তু আজ যেন তিনি সে-রকম মগ্ন হ'তে পারলেন না। থেকে-থেকে মনে পড়তে লাগলো—কিছুক্ষণ আগেকার একটি মুহূর্ত, মুহূর্তের জন্য দেখা সেই কালো মেয়েটিকে। কিন্তু কেন? মেয়েটিকে দেখে তাঁর 'ভালো লেগেছে'? ছিছি! আপন মনেই হেসে উঠলেন তিনি—না, তা নয়—এটা যেন একটা গবেষণার বিষয় হ'য়ে উঠেছে, প্রায় একটা দুশ্চিন্তা। মনে হচ্ছে আগে একে দেখেছিলেন, শুধু দেখেছিলেন নয়, চিনতেন, কিছু-একটা ছিলো তাঁর সঙ্গে ঐ—কিন্তু-কী? কবে? কোথায়? কিছুতেই মনে পড়ে না, অথচ মনে করার চেষ্টাটাকেও, এই স্বাদু, শীতল ককটেল পান করতে-করতেও, কিছুতেই ত্যাগ করা যাচ্ছে না।

হাসিগল্পের ফাঁকে-ফাঁকে হঠাৎ মাঝে-মাঝে রেখা ফুটে উঠলো গগনবরনের চওড়া কপালে।

পার্টিটা রাত বারোটা অবধি চলবে মনে হ'লো, সাড়ে-দশটার একটু পরে অনেক অনুরোধ উপরোধ কাটিয়ে গগনবরন উঠে পড়লেন। নিজেকে অত্যন্ত বেশি প্রশ্রয় দেয়া তাঁর অভ্যাস নয়, আহার নিদ্রা ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মের ব্যতিক্রম কিছুতেই হ'তে দেন না; কিন্তু আজ বোধহয় একটু বেশিই পান ক'রে ফেলেছিলেন—চোখ যেন ঘুমে জড়িয়ে আসছে—অথচ হোটেলের বিছানায় শুয়ে-শুয়ে ঘুম আর আসে না। কেবলই মনে পড়ে সেই কালো মেয়েটিকে—সে যেন গগনবরনের অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে ছিলো ওখানে, কতকাল ধ'রে অপেক্ষা করছে সে। গগনবরন বুঝলেন যে এ-রকম মনে হওয়াটা সুস্থ নয়, স্বাভাবিক নয়, সমস্ত জিনিশটাই একেবারে বাজে, নিজেকে সচেতন ও সংযত করবার চেষ্টা করলেন বার-বার—কিন্তু যতক্ষণ ঘুম না এলো, ততক্ষণ মুহূর্তের জন্যও শান্তি পেলেন না।

পরের দিন কালকা মেলে তিনি যাবেন ঠিক হয়েছে—সারাদিন কিছু করবার নেই। বেলা ন'টা অবধি শুয়েই রইলেন, তারপর তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক মন্থর তালে প্রভাতী কর্তব্যগুলি সম্পন্ন করতে-করতে সাড়ে-দশটা বাজালেন। কাপড়চোপড় প'রে প্রস্তুত হ'তেই চৌরঙ্গির ঐ দোকান তাঁকে টানলো। সত্যি-সত্যি কেউ যেন দূর থেকে আস্তে-আস্তে তাঁকে কাছে টেনে নিচ্ছে—এ চেতনা দৈহিক, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অনস্বীকার্য। সিঁড়ি পার হ'য়ে রাস্তায় নামলেন তিনি, ট্যাক্সির আমন্ত্রণ উপেক্ষা ক'রে হাঁটতে লাগলেন—শুধু যে গন্তব্য খুব কাছে ব'লেই ট্যাক্সি নিলেন না তা নয়—হাঁটতে ভালো লাগছিলো, মনে হচ্ছিলো রওনা হওয়া আর পৌঁছনোর মাঝখানকার সময়টুকু একটু দীর্ঘ হওয়াই যেন ভালো। তবু নিমেষে কেটে গেলো পথ, শো-কেসের মোটা কাচে চকিতে নিজের ছায়া

দেখলেন একবার, তারপর দাঁড়ালেন গিয়ে মেয়েটির সামনে।

আজও মেয়েটি ঠিক সেই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, সেই শাড়িটিই তার পরনে, তেমনি অস্পষ্ট শূন্যতায় নিবদ্ধ তার চোখ। গগনবরনকে দেখে সে চিনতে পারলো কিনা কে জানে, তার দেহে একটু যেন দ্রুত প্রাণ-সঞ্চার হ'লো, জিগেস করলো না কী চাই, কোনো কথাই বললো না, শুধু চোখে-মুখে একটি প্রত্যাশা নিয়ে একই ভাবে দাঁড়িয়ে রইলো।

কেনবার যোগ্য কিছুই প্রায় নেই, তবু ওরই মধ্যে গগনবরন নেড়ে-চেড়ে দেখতে লাগলেন। এক শিশি ঘামাচির ওষুধ হাতে তুলে বাংলায় বললেন, 'কত দাম?' বাংলাটা তাঁর নিজের কানেই অদ্ভুত শোনালো। আগের মুহূর্তেও কিছু ভাবেননি—হঠাৎ মুখ দিয়ে বাংলা বেরিয়ে গেলো—তাঁর কণ্ঠনালীর ভিতর দিয়ে যেন কথা ক'য়ে উঠলো অন্য কেউ। বাংলা শুনে মেয়েটি ঈষৎ চমকালো, গগনবরনের মুখের উপর একবার দৃষ্টি ফেলে নামিয়ে নিলে চোখ, তারপর ইংরেজিতেই জবাব দিলে, 'ওয়ান-টেন'।

'আর এটা?' মশকনিবারক কুণ্ডলীর বাক্সে হাত রাখলেন গগনবরন।

এবার মেয়েটি বাংলাতেই জবাব দিলো, 'বারো আনা।'

বারো আনা, বারো আনা—গগনবরন কথাটা কয়েকবার মনে-মনে উচ্চারণ করলেন, নিজের রসনায় যেন স্বাদ গ্রহণ করলেন তার। ঘামাচির ওষুধ, মশা-তাড়ানো ধোঁয়া—এমনি আরো কত ছাইভস্ম কিনে গগনবরন যখন চ'লে আসছেন, মেয়েটি হাত তুলে নমস্কার করলো। হঠাৎ একটা সুখের শিহরণ গগনবরনের মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেলো। দোকান থেকে যখন বেরিয়ে এলেন, তাঁর মনে হ'লো তিনি এমন-কিছু পেয়েছেন যা অভাবনীয়, এমন একটা জিৎ তাঁর হয়েছে যা এতদিন ভাবতেও পারেননি।

বেয়ারাকে ব'লে দিলেন যে আজ তাঁর যাওয়া হবে না, তারপর হোটেলের ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে তাঁর নতুন পাওয়া নিঃশব্দ আনন্দের

কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। কেন এই আনন্দ, কী এর অর্থ, কিছুই ভাবলেন না তিনি—কোনো প্রশ্ন, কোনো সংশয়কে প্রশ্রয় দিলেন না, বুদ্ধি তার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে এসে দরজার বাইরে থেকেই ফিরে গেলো। কলকাতায় তিনি দেখেছেন মেঘ সরিয়ে দিয়ে হঠাৎ যখন সূর্য দেখা দেয়, দেখতে-দেখতে আকাশ নীল হ'য়ে ওঠে, রৌদ্র সারা পৃথিবীটাকে প্রেমিকের মতো জড়িয়ে ধরে—এও সেই রকম, এতে দ্বিধা নেই, বাধা নেই, এর সঙ্গে তর্ক চলে না। দুপুরবেলা নিজের ঘরে খাবার আনিয়ে খেলেন—মনে হ'লো লোকের সামনে বেরোনো যেন অসম্ভব—তারপর ব'সে-ব'সে মা-কে একখানা লম্বা চিঠি লিখলেন। অত কিছু লেখবার ছিলো না, কিন্তু কথার পরে কথা এলো, অথচ চিঠিটা ডাকে পাঠিয়ে দিয়ে মনে হ'লো আসল কথাই লেখা হ'লো না। কিন্তু আসল কথাটা কী? কী, তা তিনি নিজেও জানেন না, তাকে রূপ দেবার ভাষা তাঁর নেই। শুধু একটা ভালো লাগার সমুদ্রে আস্তে-আস্তে তিনি ডুবে যাচ্ছেন, তারই ঢেউয়ের মাথায়-মাথায় মুহূর্তগুলো চিকচিক ক'রে জ্বলছে।

হোটেলের ভৃত্য বৈকালিক চা দিয়ে গেলো; একটু-একটু ক'রে অনেকক্ষণ ধ'রে চা খেলেন গগনবরন। কিছুই করবার নেই, অথচ সময় যে তার হয়েছে তাও নয়—ঘড়িতে চোখ পড়লো একবার, পাঁচটা প্রায় বাজে। পাঁচটা! হঠাৎ গগনবরন চমকে উঠলেন—পাঁচটাতেই তো ঐ দোকান বন্ধ হয়? এ-কথা মনে হবার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি আর টিঁকতে পারলেন না, লাফিয়ে উঠলেন চেয়ার ছেড়ে, এক মিনিটের মধ্যে বেশ-ভূষার সংগতিবিধান ক'রে রাস্তায় নেমে এলেন, দ্রুত পা চালিয়ে কর্জন-পার্ক পার হ'য়ে এসে দাঁড়ালেন দোকানের বড়ো দরজা পার হ'য়ে গলির মুখে, যেটা ওদের নিজেদের যাওয়া-আসার রাস্তা।

তখন লেডলর ঘড়িতে ঠিক পাঁচটা। গগনবরন সিগারেট ধরিয়ে

অপেক্ষা করতে লাগলেন—তারপর এক-এক ক'রে কর্ম-ক্লান্ত মেয়ে-পুরুষ গলি দিয়ে বেরোতে লাগলো। ফিরিঙ্গি মেয়েরা দু-তিনজন ক'রে-ক'রে আসছে কিচিরমিচির কথা বলতে-বলতে; উঁচু তাদের বুক, ভঙ্গি উদ্ধত, দৃষ্টি নিঃসংকোচ। একটু পরে এলো সেই কালো মেয়েটি—একা, আনত, বিলীয়মান। গগনবরনের হৃৎস্পন্দন দ্রুত হ'লো, মেয়েটি রাস্তায় নামতেই তার সামনে দাঁড়িয়ে ইংরেজিতে বললেন, 'আপনার সঙ্গে একটা কথা বলতে পারি?'

মেয়েটি থমকে দাঁড়িয়ে চোখ তুলে তাকালো; গগনবরনকে দেখেই তার সমস্ত মুখে একটা লাল আভা ছড়িয়ে পড়লো, তার পরেই সমস্ত রং মুছে গেলো। তার মুখের ঐ ম্লানিমা গগনবরনের হৃদয়কে মুহূর্তে যেন নিঃস্ব ক'রে দিলো, কী বলবেন ভেবে পেলেন না, শুধু মূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইলেন। সেই গগনবরন—দিল্লি-শিমলের বড়ো কর্তা, যাঁকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্তম্ভ না হোক অন্তত একটি ছোটোখাটো খুঁটি বলা যায়, এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার যুদ্ধের নেতারাও যাঁর পরামর্শ প্রত্যাখান করেন না—সে-ই। কিন্তু মেয়েটি আর চোখ তুললো না; ক্ষীণ, ক্লান্ত, অস্ফুট দেহ নিয়ে আস্তে-আস্তে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলো। আর সেই ভিড়, ব্যস্ততা, কলরবের মধ্যে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন গগনবরন।

কিন্তু চোখ তাঁর সজীব তখনো। বরং, এত বেশি সজীব আগে যেন কখনো হয়নি। শুধু চেয়ে-চেয়ে দেখা, আর-কিছুই করবার নেই এখন। ঐ বেঁটেমতো বাঙালি বাবুটি স্ত্রীকে নিয়ে ভীরু চোখে সিনেমা থেকে বেরোলো, একদল ছাত্র চ'লে গেলো চেঁচিয়ে কথা বলতে-বলতে, ফুটপাতে ব'সে হিন্দুস্থানি মুটে ময়লা গামছা নেড়ে হাওয়া খাচ্ছে, মোলায়েম চেহারার উড়ে বামুন মিটমিটে চোখে কথা বলছে পানওলার সঙ্গে, একদল জবুথবু গ্রামের মেয়ে হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছে দোকানের জানলার

অবিশ্বাস্য প্রদর্শনীর দিকে—না, আর না, আর সইতে পারে না চোখ, এই অভাবের ভার আর বইতে পারে না মন। সবই চোখে পড়লো গগনবরনের, তবুও শেষ নেই দেখার।

স্বপ্নে-চলা মানুষের মতো গগনবরন হোটেলে ফিরলেন। যেন কোনো বিরাট পরিশ্রম করেছেন, এমনি ক্লান্ত তিনি। সুখ নেই, দুঃখ নেই, কিছু নেই: শুধু শূন্যতা। কিংবা এই সুখ, এই দুঃখ এত তীব্র যে তা অনুভূতির অতীত। ত'হলে এখন? এখন কী? হ্যাঁ—যেতে হবে, চ'লে যেতে হবে—আজই—এখনই। ঘড়ির দিকে চোখ ফেললেন—গাড়ি সাড়ে-সাতটায়, সময় আছে। গুছিয়ে নিতে দেরি হ'লো না, কিছু আগেই স্টেশনে এলেন। প্ল্যাটফর্মের মুখর জনতা তাঁকে যেন কোনো রূপকথার এক-একটি পাতা প'ড়ে-প'ড়ে শোনাতে লাগলো—তার ভাষা তিনি বোঝেন না, কিন্তু মনে হ'লো যেন ওর পিছনে কতকালের পুরোনো, বড়ো, সজীব একটা অর্থ, বনের মধ্যে জানোয়ারের মতো লুকিয়ে আছে। আজ কি গাড়ি একটু দেরি ক'রে ছাড়বে?—গগনবরন আড় চোখে ঘড়ির দিকে তাকালেন, কিন্তু না—কাঁটায়-কাঁটায় ঘণ্টা পড়লো, কামরা দুলে উঠলো; আলোর অক্ষরে ভরা প্ল্যাটফর্মটাকে প্রত্যাখ্যাত আবেদনের মতো একটানে ছিঁড়ে ফেলে এগিয়ে চললো ট্রেন; রওনা হওয়ামাত্র ঝড়ের মতো হৈ-হৈ ক'রে মিলিয়ে গেলো কয়লার ফুলকি-জ্বলা অন্ধকারে।

ধাবমান ট্রেনের ছন্দ শুশ্রূষা আনলো, তন্দ্রা নামলো চোখে। স্বপ্নে মনে হ'লো শিমলার একটি বনপথ দিয়ে হেঁটে চলেছেন। দু-দিকে পাহাড়, দূরে উপত্যকা, ঝিরিঝিরি ছায়া ক'রে আছে আপেল গাছ। উপত্যকাটি আলো-ছায়ায় চিতাবাঘের চামড়ার মতো প'ড়ে আছে; কোঁকড়া সবুজ ঢালু হ'য়ে নামছে সেখানে, আর তার উপরে নীলের আভা কান্না-থামা চোখের মতো ছলোছলো। সুখ। যেন পৃথিবীতে সুখ ছাড়া কিছু নেই, কেউ দুঃখী নয়, কিছুই দুঃখের

নয়। গগনবরনও সুখেরই বেগে চলেছেন, আর তার উৎস ঐ উপত্যকা। সূর্য থেকে যেমন আলো ছড়ায়, তেমনি ঐ সবুজ গহ্বর থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে সুখ। ওখানে যাবেন তিনি, কিন্তু যত চলছেন, উপত্যকার দূরত্ব একটুও কমছে না। দ্রুত চলতে লাগলেন, দু-পাশে গাছগুলি হাত তুলে-তুলে তাঁকে উৎসাহ দিলো, ঠাণ্ডা হাওয়া এসে বার-বার মুছে নিলো ক্লান্তি, তবু কাছে এলো না উপত্যকা, সবুজ তবু সুদূর হ'য়ে রইলো। হঠাৎ ছোট্ট একটু কষ্ট বুক-ভরা সুখের উপর চাপ দিতে লাগলো; নিশ্বাস যেন রুদ্ধ, বুক ফেটে যাচ্ছে। জলের উপরে এক ফোঁটা তেলের মতো সুখের বুকে সেই দুঃখ ক্রমে ছড়াতে লাগলো, আর চলতে পারছেন না। মাথা নিচু হ'লো, মেরুদণ্ড বাঁকা হ'লো, পা তুলতে গিয়ে পা উঠলো না—এ কোথায় এলেন, এ যে ভীষণ চড়াই! মুখ তুলে দেখলেন প্রকাণ্ড কয়েকটা পাহাড় চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে তাঁকে—আর পথ নেই, এই পাষাণপুঞ্জের মধ্যে বন্দী হলেন বুঝি—সমস্ত শরীর ঘেমে উঠলো, এই পাহাড় জীবন্ত, এগিয়ে আসছে একটু-একটু ক'রে, তাদের আগুনের মতো নিশ্বাস লাগছে গায়ে। গগনবরন আর দাঁড়াতে পারলেন না, তাঁর দেহটি অবশ হ'য়ে প'ড়ে গেলো পথের ধুলোয়, তক্ষুনি চোখে পড়লো পাহাড়ের ভিতর দিয়ে একটু ফাঁক, ঐ তো সবুজের ঝিলিমিলি, ঐ তো দিগন্তের নীল—ঠিক পাহাড়ের ওপারেই। দু-হাত বাড়িয়ে গগনবরন লাফ দিয়ে পড়লেন, হঠাৎ একটা উন্মাদ শব্দ প্রতিধ্বনিত হ'লো দিক্-দিগন্তে, পাহাড়ের গা বেয়ে পড়তে-পড়তে গগনবরনের ঘুম ভাঙলো।

চোখ মেলে বুঝলেন, ঠাণ্ডা মাটির ওপর শুয়ে আছেন, মাথার উপরে তারা চকচক করছে। নড়তে গিয়ে মনে হ'লো দেহ আর তাঁর নিজের নেই—তাঁর দেহ তাঁর সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে একটা কষ্টের স্তূপের মতো একটু দূরে প'ড়ে আছে। কিসের এই কষ্ট? তার রূপ নেই, তার ভাষা নেই; তা

অস্পষ্ট, অনির্ণেয় অথচ পরিব্যাপ্ত। ক্রমে সে কষ্ট তাঁর দেহ থেকেও বিচ্ছিন্ন হ'লো, ছড়িয়ে পড়লো দূরে দূরান্তরে ; চারদিক থেকে একটা কান্নার আকুলতা, একটা বিরাট চীৎকারের মিশ্রতান গম্ভীর ধৈর্যশীল আকাশের দিকে উঠলো কান পেতে শুনে তবে বুঝলেন যে ও-সব আওয়াজ মানুষ-পশুরই কণ্ঠনির্গত। কী হয়েছে ? গভীর অন্ধকারে ফোঁটা-ফোঁটা লালচে আলোর পাগল নাচ, ঐ তো রেল-লাইনের উঁচু বাঁধ, লাইনটা এখানে একটা তীক্ষ্ম বেগবান বাঁক নিয়ে দিগন্তের দিকে চ'লে গেছে—আশে-পাশে ছড়িয়ে প'ড়ে আছে অস্পষ্ট কালো-কালো—কী ? নিশ্চয়ই টুকরো-টুকরো পাহাড়—পাহাড় ভেঙেছেন তিনি, দিগন্তকে পেয়েছেন, শুয়ে আছেন নরম সুগন্ধি সবুজ শীতল উপত্যকায়। হাসি ফুটে উঠলো মুখে, সঙ্গে-সঙ্গে এক বিন্দু উষ্ণ আর্দ্রতা অধর স্পর্শ করলো, লবণের স্বাদ লাগলো রসনায়। হাত দিয়ে দেহটাকে স্পর্শ করলেন একবার, সিক্ত স্পর্শ, তপ্ত, অসহ্য, জন্মের অন্ধকার উৎসের মতো, জন্মের দীর্ণতার মতো। দেহ দীর্ণ হ'য়ে নিজেকে ঝরিয়ে দিচ্ছে, নিঃশব্দ নিশ্চিত স্রোতে এই আর্দ্রতার নিঃসরণ—এ তো ঐ সবুজের স্রোত, এ-লবণ ঐ সবুজেরই লাবণ্য। স্বপ্নের সেই সুখ ফিরে এলো মনে, বিশ্বে সুখ ছাড়া কিছু নেই, পরিত্যক্ত বিদীর্ণ আর্দ্র দেহটা কষ্টের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে বিকীর্ণ করছে সুখ—তার অপরিসীম, অসহনীয় অনুভূতি সব চেতনা লুপ্ত ক'রে দিলো, মুছে নিলো পৃথিবীর সব শব্দ, ভেঙে দিলো জন্ম-মৃত্যুর সীমা, মৃদু হাতে চাদ্দরা ছাড়িয়ে নিয়ে অন্ধকারের অক্ষয় সাজ পরিয়ে দিলো। তারপর অন্ধকার আলো ক'রে মা এসে সামনে দাঁড়ালেন। মা যখন যুবতী ছিলেন, যখন তাকে জন্ম দিয়েছিলেন, সেই মা। রং তাঁর কালো, দেহ তাঁর ক্ষীণ, চওড়া পাড়ের শাড়ি তাঁর পরনে। মাথা নিচু ক'রে তিনি এলেন, অস্পষ্ট চোখে, ভীরু ভঙ্গিতে, তারপর খুব কাছে এসে চোখ তুলে

তাকালেন। আকাশের তারার আলো সে-চোখে জ্বলছে, সে-চোখ জয়ী, সে-চোখে জন্ম-জন্মান্তরের ইতিহাস লেখা। গগনবরন স্তব্ধ হ'য়ে প'ড়ে রইলেন, পরিপূর্ণ, পরিপ্লুত, ঘটনার বন্ধন থেকে মুক্ত, সময়ের স্পন্দন থেকে বিচ্যুত;—আর তাঁর পরিত্যক্ত, বিচ্ছিন্ন দেহটার গূঢ় পরিশ্রমে মাটির বুকে রক্তের ধারা আস্তে-আস্তে স্ফীত হ'য়ে উঠলো।

১৯৪৫

মুক্তি

ছেলেবেলা থেকে মিনু দেখে আসছে তার মা-র কাচের আলমারিতে সাজানো সারি-সারি খেলনা, পাঁচটা মস্ত তাক পর-পর সাজানো ; বিলেতি, জাপানি, স্বদেশি খেলনা , গাটাপর্চার, রবারের, গালার, কাঠের, মাটির ; কাশী, কাশ্মির, কেষ্টনগর, কালিঘাট, এমনকি টালিগঞ্জের রথযাত্রার মেলার। টুকটুকে লাল ডল-পুতুল চকচকে নীল-নীল চোখ মেলে তাকিয়ে আছে, জমকালো বেনারসীর ঘোমটা-টানা বৌ, মাদল বাজিয়ে নাচছে তিনটে কালো সাঁওতাল, বর-ঠকানো শিঙাড়া সন্দেশ পান্তুয়া পান, আর জীবজন্তু যে কত তার অন্ত নেই। কুকুর বেড়াল থেকে আরম্ভ ক'রে বাঘ ভালুক জিরাফ গণ্ডার সিংহ। শুধু কি তা-ই, রুপোর থালা, মিনে-করা বাটি, চিনদেশের কালো চায়ের পেয়ালা, হাতির দাঁতের বাক্স, শ্বেতপাথরের তাজমহল, পিতলের বুদ্ধমূর্তি, আবলুশ-কাঠের নটরাজ—দেখে-দেখে চোখে আর পলক পড়ে না। আলমারিটা মা-র বিয়ের সময় মা-র দিদিমা তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন—সে-আলমারিরও রূপের তুলনা নেই—যেন কালো একটি পরি, যেমন হালকা তেমনি ছিমছাম—তিন দিকে তিনটি আস্ত কাচ মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমানে নেমে এসেছে—দোকানের জানলার মতো পুরু, মসৃণ, ঝকঝকে, ভিতরকার সমস্ত জিনিশ পরিষ্কার দেখা যায়, আবার নিজের চেহারার ছায়াও পড়ে। মিনুর জানাশোনা যে-ক'টি বাড়ি আছে, তাঁর কোনোটিতেই এমন একটি আশ্চর্য জিনিশ নেই—পৃথিবীর অন্য-কোনো বাড়িতেই আছে কিনা কে জানে।

আলমারিটি বসানো আছে ড্রয়িংরুমে। সে-ঘরে মিনুর যাওয়া এতকাল বারণ ছিলো, এখন সে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে, তাই মাঝে-মাঝে গিয়ে একটু বসতে পায়। তিনুর জন্য কষ্ট হয় তার, বেচারা এখনো ছেলেমানুষ আছে—ড্রয়িংরুমের যোগ্য হয়নি। কে জানে কোনটাতে হাত দিতে গিয়ে কী ভেঙে ফেলে—কোনো-একটা চেয়ার ঠিক জায়গা থেকে

হয়তো একটু সরিয়েই ফেললো। ঘরটি ছোটো, জিনিশপত্র অনেক, মেঝেতে কার্পেট, দেয়ালে ছবি, সোফাতে কুশন, কোণে-কোণে টেবিল, খোপে-খোপে ফুলদানি—আর সমস্ত জিনিশের উপর তার সৌন্দর্যের আভা ফেলে রানির মতো দাঁড়িয়ে সেই আলমারিটি। মা রোজ সকালে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ঘরটির ঝাড়পোঁছ করান, তারপরেই ও-ঘরে তালা পড়ে; অভ্যাগত কেউ না-এলে খোলাই হয় না। মিনু কখনো দেখেনি মা-বাবাকে ও-ঘরে বসে গল্প করতে, বাড়িতে লোকজন যখন বেশি হয়েছে লোকেরা বারান্দাতেও শুয়েছে কিন্তু ও-ঘরে কাউকে শুতে দেয়া হয়নি; সমস্ত বাড়ির মধ্যে একতলার এ-ঘরটি যেন আলাদা, যেন অন্যদের—অন্যদের তো ঠিকই, বাইরের লোক না-হ'লে ও-ঘরে ঢোকাই যায় না।

একমাত্র তখনই মিনু ঢুকতে পেয়েছে ও-ঘরে, যখন এমন-কোনো আত্মীয় বা বাবার এমন-কোনো ভালোমানুষ বন্ধু এসেছেন যিনি মিনুরও খোঁজ করেছেন এসে। পা টিপে-টিপে এসে ভয়ে-ভয়ে দাঁড়িয়েছে সে, মা-র কোল ঘেঁষে, বড়ো-বড়ো চোখ মেলে চারদিকে তাকিয়েছে অবাক হ'য়ে—কী সুন্দর এই ঘর, কী আশ্চর্য সুন্দর—আর তার পরেই তার সমস্ত মন-প্রাণ যেন চোখের দৃষ্টি হ'য়ে পড়েছে ঐ আলমারিটির উপর, চোখ আর ফেরাতে পারেনি, বাবার ভালোমানুষ বন্ধু কি তাঁর স্ত্রী আদর ক'রে যে-সব কথা বলেছেন তার একটাও কানে যায়নি, জবাব দিতে পারেনি কোনো কথার, শুধু হঠাৎ তাকে নিয়েই যে কথা হচ্ছে সে-বিষয়ে সচেতন হ'য়ে শরীরটাকে মুচড়িয়েছে নানা অদ্ভুত ভঙ্গিতে। দেখতে তাকে নিশ্চয় তখন ভালো হ'তো না, অভ্যাগতরাও ভালো ভাবতেন না তাকে—আর মা তো সব সময়ই বলতেন, মিনুটা ম্যানার্স শিখলো না একেবারে! কিন্তু অমন আশ্চর্য একটা আলমারি চোখের সামনে থাকলে ম্যানার্সের কথা কি মনে থাকে কারো! মা যখন অতিথিদের চা ঢেলে দিচ্ছেন,

মিন্টু তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপিচুপি বলেছে—মা, কাছে যাই একটু?

—কোথায়?

—একটু কাছে, আলমারিটার কাছে।

—বেশ তো, যাও না। বেশ মিষ্টি ক'রেই বলেছেন, সে-সময়ে মা-র মেজাজ হয়তো ভালো ছিলো।

কাছে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দু-চোখ ভ'রে দেখেছে মিন্টু, ভিতরে যা-কিছু আছে সব যেন চোখে ক'রে নিয়ে যাবে। টুকটুকে ডল ঝকঝকে চোখে নীল আলো জ্বেলে বলেছে—এসো, এসো। বেনারসি ঘোমটার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে ছোট্ট বৌটির ফিশফিশে গলা—এসো না। মাদল বাজিয়ে সাঁওতাল ছেলেরা হৈ-হৈ ক'রে ডেকেছে তাকে। কেষ্টনগরের কুচকুচে কুকুরটা তাকে দেখতে পেয়েই লাফিয়ে উঠেছে, জঙ্গলের মধ্যে পাইচারি করতে-করতে আগুন-রঙা বাঘ থমকে দাঁড়িয়েছে, আর মোটাসোটা রোঁয়া-রোঁয়া আদর-আদর চেহারার বিলেতি ভাল্লুকটার সে কী হাসি। ওদের হাসাহাসি দাপাদাপি চ্যাঁচামেচিতে আলমারিটাই উল্টিয়ে কাৎ হ'য়ে চুরমার হবে না তো? কিসের! শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে আলমারি, স্তব্ধ হ'য়ে আছে সারি-সারি পুতুল, রাশি-রাশি খেলনা, তাজমহল, নটরাজ, বুদ্ধমূর্তি। শক্ত ঠাণ্ডা কাচ আঙুল দিয়ে একটু স্পর্শ করেছে মিন্টু, একবার তার নিষ্ঠুর বুকে মুখ ঠেকিয়েই স'রে এসেছে—কত সুখ, কত ইচ্ছা, কত স্বপ্ন আড়াল ক'রে রেখেছে ঐ স্বচ্ছ কঠিন হৃদয়হীন কাচ, সমস্ত দেখা যাবে অথচ কিছুই ছোঁয়া যাবে না, ডেকে আনবে অত্যন্ত কাছে, রেখে দেবে অন্তহীন দূরে। পৃথিবীতে এত যদি সুখের ছড়াছড়ি তাহ'লে কোনো সুখই কেন পাওয়া যাবে না; যদি কোনো সুখই পাওয়া যাবে না তাহ'লে সুখের কেন ছড়াছড়ি?

হৃদয়ের এই উদ্দাম ইচ্ছাকে সে কি কখনো তার মা-র কাছে প্রকাশ করেনি? হায়রে, সে-কথা ব'লে আর লাভ কী। একটি পুতুল একটুখানি হাতে নিয়েই রেখে দেবে ব'লে সে যখন কেঁদে-কেটে মা-র পায়ে পড়েছে, মা তখন স্নানের আগে চুল ছেড়ে দিয়ে চন্দন সাবান আনবার জন্য ঝি-কে টাকা বের ক'রে দিতে-দিতে বলেছেন—তা তো বটেই! তোমাদের হাতে ও-সব দিই আর ভেঙে-চুরে সব শেষ ক'রে দাও! কেমন সুন্দর সাজানো আছে—ভালো লাগে না দেখতে।

—পুতুল কি দেখবার জন্য নাকি, পুতুল তো খেলবার জন্য। ছোট্ট মিনু তর্ক করেছে।

—ভাঙবার জন্য তোর হাত শুড়শুড় করে কেন বল তো! সুন্দর জিনিশ সাজিয়ে রাখতে হয়। দেখতে হয়, নাড়াচাড়া করলেই তো নষ্ট।

—মোটেও না! মোটেও ভাখো না তোমরা! ঘর তো বন্ধই থাকে সারাদিন।

আঙুল নেড়ে-নেড়ে পিঠের উপর চুল ছড়িয়ে দিতে-দিতে মা বলেছেন—সেইজন্যই তো টি'কে আছে এতদিন ধ'রে। জানো, আমি যখন তোমার মতো ছিলুম, তখনকার কয়েকটা পুতুলও আছে ওখানে। আলমারির সঙ্গেই দিদিমা দিয়েছিলেন।

মিনু অবাক হ'য়ে বলেছে—মা, তুমি কোনোদিন পুতুল খেলোনি—কোনদি—ন না? সব সময় কেবল সাজিয়েই রেখেছো?

—সেইজন্যই তো আছে সব, মুচকি হেসে মা বলেছেন। যেখানে যা-কিছু পেয়েছি সব আলমারিতে বন্ধ করেছি ব'লেই না ও একটা দেখবার জিনিশ হয়েছে আজ!

সে-কথা সত্য। যেখানে যা-কিছু পেয়েছেন, সবই মা নৈবেদ্য দিয়েছেন তাঁর আলমারি-দেবতাকে। তিনু যখন জন্মালো মিনুর বয়স

তখন পাঁচ। তার স্পষ্ট মনে পড়ে তিমু যখন একটু-একটু দাঁড়াতে পারে, সেই রকম সময় তাদের এক কাকিমা তিমুর হাতে সিল্কের ঘাঘরা-পরা একটি ফুটফুটে মেমসাহেব এনে দিয়েছিলেন—আর বোকা তিমু তক্ষুনি সেই সুন্দরীর মুণ্ডুটা খেয়ে ফেলেছিলো চিবিয়ে-চিবিয়ে। সেই দুর্ঘটনার পর তিমুর হাতে কোনো ভালো পুতুল আর ওঠেনি। তার জন্য আত্মীয়-স্বজনরা যে যা খেলনা এনেছেন মা তক্ষুনি তুলে ফেলেছেন তাঁর কাপড়ের আলমারিতে আর সেখান থেকে যথাসময়ে চালান করেছেন সেই স্বচ্ছ সুন্দর সুদূর স্বপ্ন-পুরীতে। মিমু মনে-মনে ভেবে দেখেছে যে এমন হতেই পারে না যে সে-ও ছেলেবেলার দু-একটা পুতুলকে অঙ্গহীন করেনি—কাচের ভিতর থেকে তাকে যারা ডাকে তারা অনেকেই হয়তো তারই জন্মদিনের উপহার। লোকেরা তাকে যা দিয়েছে, তিমুকে যা দিয়েছে তা তো তাদেরই, মা কেন নেবেন সে-সব? মিমুর মনে কখনো-কখনো খুব একটা বিদ্রোহ ধাক্কা দিয়েছে, কিন্তু কিছু বলেনি, বলতে সাহস পায়নি। আর ব'লেই বা কী হবে—ঐ কাচের মতোই ঠাণ্ডা মা-র মন, ঐ রকমই কঠিন। কিন্তু তাও তো নয়—মা তো কত ভালোবাসেন তাদের, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব'সে-ব'সে ন্যাকড়া দিয়ে কত বড়ো-বড়ো আর ছোটো-ছোটো পুতুল বানিয়ে দেন, কালি দিয়ে এঁকে দেন নাক কান চোখ মুখ, শেলাইয়ের টুকরো-টুকরো ছিট দিয়ে পরিয়ে দেন জামা-কাপড়—জোড়া-জোড়া মা বাবা, আর তাঁদের প্রত্যেকের সাত আটটি ক'রে ছেলেপুলে—দোতলার সিঁড়ির মাথায় একটু যে-জায়গা আছে, সেখানে সুখে-স্বচ্ছন্দে বসবাস করে কয়েকটি পুতুল-পরিবার। ছোটোরা বড়ো হয়, বিয়ে করে, তাদের আবার ছেলেপুলে হয়, মাকে বললেই যত ইচ্ছে বাচ্চা-পুতুল পাওয়া যায়—তারপর জনসংখ্যা এত বাড়ে যে বুড়োদের মধ্যে কারো-কারো মরবার দরকার হয়, তাই কয়েকদিন অসুখে ভুগে

বুড়োরা ঠিক নিয়মমতো ম'রে যায়, মরলেও কিন্তু তাদের পোড়ানো হয় না, তাদের গা খুলে-খুলে যে কাপড় বেরোয় তা দিয়ে মা আবার তাদের প্রপৌত্রদের তৈরি করেন।

এখন মিন্নুর বয়স তেরো, কিন্তু পুতুল খেলার ঝোঁক এখনো তার কাটেনি। তার সঙ্গে-সঙ্গে তিন্নুও পুতুল নিয়ে মত্ত—তার পৌরুষের গৌরব, তার হাফ-প্যাণ্টের মহিমা মনেই থাকে না। তার পড়াশুনো আমোদ-প্রমোদ হৈ-চৈয়ের ফাঁকে-ফাঁকে সকালে-বিকেলে খানিকক্ষণ পুতুলের পরিচর্যা তাদের করাই চাই। একদিন একটা পুরোনো ময়লা পুতুলকে মিন্নু নতুন কাপড় পরাচ্ছিলো, তিন্নু কাছে ব'সে দেখতে-দেখতে হঠাৎ ব'লে উঠলো—দিদি, তোমার কিছু ইচ্ছে করে?

—কী ইচ্ছে করে?

—কিছু ইচ্ছে করে কিনা তা-ই বলো না।

—ইচ্ছে তো কতই করে, তার আবার শেষ আছে নাকি!

—না, না, স—ব চেয়ে তোমার কী ইচ্ছে করে?

তেরোতে প'ড়ে ঈষৎ একটু থরোথরো ভাব এসেছে মিন্নুর, স—ব চেয়ে কী ইচ্ছে করে, বলা আর তত সহজ নয় তার পক্ষে। তাই সে কথাটা ঘুরিয়ে বললে—তোর কী ইচ্ছে করে বল তো।

—বলবো? আমার ইচ্ছে করে—

—বল না।

—ইচ্ছে করে নিচের ঘরে কাচের আলমারিতে যে-পুতুলগুলো আছে সেইগুলো নিয়ে খেলা করতে। তোমার করে না?

—খুব করে।

—তুমি কোনোদিন ওগুলো নিয়ে খেলেছো?

মিন্নু চুপ ক'রে রইলো। সত্য বললে অগ্রজের সম্মান রক্ষা হয় না।

—বলো না খেলেছো নাকি।

—উহুঁ। মিনুকে অগত্যা স্বীকার করতে হ'লো।

—কোনোদিন ছুঁয়েছো?

—উহুঁ।

—আমিও না। আমার এমন ইচ্ছে করে ছুঁতে, ইচ্ছে করে সবগুলোকে বুকের মধ্যে ভ'রে রাখি।

মিনু হেসে ফেলে বললে—তাহ'লে দম বন্ধ হ'য়ে মারা যাবি।

—যাই যাবো। এ-সব ন্যাকড়ার পুতুল আর ভালো লাগে না আমার।

—কেন, ন্যাকড়ার পুতুলই তো ভালো। ভাঙে না, নষ্ট হয় না, পয়সা দিয়ে কিনতে হয় না, যত ইচ্ছে পাওয়া যায়। কত সুবিধে!

তিনু বললে—আমি সুবিধে চাই না, আমি ভালো চাই। দিদি, আমাকে তুমি দিতে পারো আলমারির একটা পুতুল বের ক'রে?

হঠাৎ একটা দুঃসাহসের ঝোঁকে মিনু ব'লে ফেললো—পারি, যদি মা-র চাবির গোছা এনে দিতে পারিস।

—নিশ্চই পারবো। মা-র তোশকের তলাতেই চাবি থাকে তো—মা যখন দুপুরবেলা ঘুমুবেন, তখন তোশক তুলে নিয়ে এলেই হ'লো!

—ধরা পড়লে আমার নাম বলবি না তো?

—না, না, না। কিন্তু তুমি আমাকে একটা পুতুল বের ক'রে দেবে তো ঠিক—না, না, একটা না, দুটো। আমি কিন্তু হাতে নেবো—কেমন?

—বেশ, কিন্তু খুব সাবধান। যদি হাতে লেগে নষ্ট-টষ্ট হয় তাহ'লে মা কিন্তু আর আস্ত রাখবেন না।

—ঐ পুতুল দিয়ে আমরা বোমা-বোমা খেলবো—অ্যাঁ, দিদি? তিনুর মুখ ঝলমল ক'রে উঠলো।

ঠিক তার মা-র মতো ক'রে মিনু বললে—তাহ'লেই হয়েছে!

—আমি এমন সাইরেন দেবো দিদি, যে সকলেই ভাববে সত্যি বুঝি। মা তো নিশ্‌—চয়ই!

—ব্যস, তাহ'লেই মা ছুটে নিচে এসে স—ব দেখে ফেলবেন! বুদ্ধির ঢেঁকি!

—কেন, বোমায় তো আর পুতুলদের কিছু হবে না, সাইরেনের সঙ্গে-সঙ্গেই তুমি ওদের শুইয়ে দেবে চেয়ারের তলায়, একেবারে অল ক্লিয়ার হ'য়ে গেলে তবে ওরা বেরুবে। কিছু হবে না ওদের।

মিনু টিপি-টিপি হেসে বললে—হয়েছে, হয়েছে, আর বোমা-বোমা খেলতে হবে না। কলকাতায় শিগগিরই বোমা পড়বে জানিস?

—সত্যি? কী মজা। তিনু হাত-তালি দিয়ে হেসে উঠলো।

—দূর বোকা! বোমা পড়লে কত বাড়ি ভেঙে যায়, কত লোক ম'রে যায়, আর তুই কিনা বলছিস মজা!

—বাড়ি ভেঙে যায়? আমাদের বাড়ি ভেঙে যাবে?

—কে জানে। যেতেও পারে।

—সত্যি যদি ভেঙে যায়, কী মজাই হয়!

—ও মা, বাড়ি ভাঙলে আবার মজা কী? কী যে তুই বলিস!

—বাঃ, মজা না! রোজ-রোজ তো বাড়ি ভাঙে না, একদিন সত্যিই যদি ভাঙে তো কী কাণ্ড বলো তো। সেদিন তো আর নাইতে হবে না, খেতেও হবে না, বিকেলবেলা মোটা-মোটা কুটকুটে জামাও পরতে হবে না—সারাদিন ধ'রে যা ইচ্ছে তা-ই করা যাবে, কেউ কিছু বলবে না—এর চেয়ে মজা আর কী হ'তে পারে!

মিনু গম্ভীরভাবে বললে, তুই ভারি ছেলেমানুষ আছিস এখনো।

ঘর থেকে মা-র গলা শোনা গেলো—মিনু, তিনু, খেতে এসো।

খেলা ফেলে উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে তিনু চুপি-চুপি বললে, দেখলে তো

দিদি! বার-বার খেতে এত বিশ্রী লাগে আমার! বোমা প'ড়ে বাড়ি ভাঙলে এ-সব যন্ত্রণা তো থাকবে না।

এ-সব কথাবার্তা মিনুর মন থেকে মুছেই গিয়েছিলো, কিন্তু কয়েকদিন পরে এক দুপুরবেলায় তিনু ছুটে এসে দিদির গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে বললে—দিদি, এনেছি।

—কী রে?

—এই ত্যাখো! তিনুর হাতে মা-র চাবির গোছা রুনুঠুনু আওয়াজ করলো।

তার আগের দিন বড়োদিনের ছুটি হয়েছে ইশকুলে। বারান্দায় একটু রোদের ফালি এসে পড়েছে, সেই রোদটুকুতে পা ছড়িয়ে ব'সে মিনু গল্পের বই পড়ছিলো। ইশকুলে যারা পড়ে তাদের পক্ষে বড়োদিনের ছুটির মতো ছুটি নেই; পরীক্ষা শেষ, উৎকণ্ঠার অবসান, কয়েকদিন পরে নতুন ক্লাশ, নতুন বই, জীবন-বইয়ের নতুন একটা পাতা ওল্টানো। মিনু এবার উঠবে ম্যাট্রিকের আগের ক্লাশে, শৈশবের হৈ-চৈ থেকে অনেকটা দূরে স'রে এসেছে যেন, চুপচাপ নিরিবিলি সময় কাটাতে এখন ভালোই লাগে তার। গল্পের বইয়ের রং লাগছিলো যে-শান্ত অবসরে, কল্পনার তাপ লাগছিলো শীতের দুপুরবেলার যে-আরামে, তিনু হঠাৎ তার মধ্যে উপদ্রবের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো।

বই বন্ধ ক'রে মিনু বললে—দুষ্টু! কোথায় পেলি?

—কোথায় আবার! যেখানে থাকে সেখানেই! মা অঘোরে ঘুমুচ্ছেন—শিগগির চলো দিদি।

—সত্যি বলছিস?

—সত্যি না তো কী! তুমি যে কেমন—ওঠো—চলো শিগগির—আমি কিন্তু সবগুলিতেই একবার-একবার হাত দেবো—ওঠো না! দিদির আঁচল ধ'রে টানতে লাগলো তিনু, টানতেই-টানতেই তাকে নামিয়ে

আনলো নিচে।

ঘরের দরজায় মস্ত তালা—এর চাবি কোনটা? কোনো চাবিই লাগে না—তার একটা কারণ কি এই যে মিনুর হাত কাঁপছে? প্রায় যখন আশা ছেড়ে দিয়েছে মিনু, তখন দৈবাৎ একটা চাবি লেগে গেলো, খুলে গেলো দরজা, ভারি নীল পরদা সরিয়ে ভাই-বোনে ভিতরে ঢুকলো। ঘরের ভিতরে কেমন একটা ঝাপসা গন্ধ, যেন অনেকদিন এখানে কেউ নিশ্বাস নেয়নি, নিখুঁত ক'রে সাজানো সুন্দর-সুন্দর জিনিশগুলি যেন সত্যি নয়, যেন ছবিতে আঁকা। প্রত্যেকটি জানলা ঘেঁষে-ঘেঁষে বড়ো-বড়ো বালির বস্তা এমন ক'রে রাখা আছে যে ঘরে আলো খুবই অল্প। বোমা-বোমা রব ওঠবার পর বাবা এ-সব ব্যবস্থা করেছেন—সাইরেন দিলে এ-ঘরেই আশ্রয় নিতে হবে। কতবারই সাইরেন দিলো, হুড়হুড় ক'রে নিচে নেমে এলো তারা, কিন্তু বোমা তো পড়ে না। মিনু মুখে যা-ই বলুক, মনে-মনে সে-ও তিনুর মতো চায় যে বোমা পড়ুক—এতদিন ধ'রে এত শুনছে, ব্যাপারটা কী দেখে নিতে পারবে না একবার? বোমার সময় নাকি কাচে বড্ড ভয়—এ-ঘরের সমস্ত জানলার কাচ সরানো হয়েছে, খুলে নেয়া হয়েছে বাঁধানো ফোটোগ্রাফ—আহা, ঐ আলমারির কাচও যদি খুলে ফেলতো ওরা! তা তো নয়—আলমারি ঠিক তেমনি আছে, তেমনি আশ্চর্য, উজ্জ্বল, অসহ্য, তেমনি অন্তহীন দূরত্বের দিগন্তে নির্বিকার দাঁড়িয়ে। না, না, দূর নয়, তাকে কাছে পাবার মন্ত্র শিখে নিয়েছে তারা, এখন আর ধরা না-দিয়ে তার উপায় কী। আলমারির সরু সুন্দর চাবিটি মিনু চিনতো—অস্পষ্ট একটু শব্দ হ'লো কি হ'লো না—তারপরেই বাঁধ ভাঙলো, অবরোধ ঘুচলো—টুকটুকে ডল পুতুলটি হেসে-হেসে কাছে এলো, সাঁওতাল ছেলেরা পাগল হ'লো নাচের তালে-তালে, বাঘ, ভালুক, জিরাফ, গণ্ডার গর্জন ক'রে উঠলো একসঙ্গে—প্রাণের তরঙ্গে, আনন্দের আবেগে, মুক্তির মত্ততায় সমস্ত জগৎ থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলো। কী করলো

দু-ভাইবোন ওখানে ব'সে-ব'সে, কতক্ষণ ছিলো তারা ও-ঘরে, কত সুখের রোমাঞ্চনে বিহ্বল হয়েছিলো তাদের দেহমন—তা কি তারাই জানে। সমস্ত আবার নির্ভুলভাবে সাজিয়ে রেখে, কাচ বন্ধ ক'রে, দরজায় তালা দিয়ে, যখন তারা ফিরে এলো—মিনুর মনে হ'লো সে যেন বহু দূরের পথ পার হ'য়ে এইমাত্র বাড়ি ফিরলো, ক্লান্তির ভার বিছানায় ঢেলে দিলো সে, এমনকি তিনুও তার পাশে শুয়ে প'ড়ে দু-চার বার এ-পাশ ক'রেই স্তব্ধ হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

পরের দিন তিনু চুপি-চুপি বললে দিদিকে, দিদি, আজও ?

—আজও ? মিনুর চোখ চকচক ক'রে উঠলো, একটু যেন পাংশু হ'য়ে গেলো মুখ।

তিনু তার দু-চোখে সমস্ত কথা ঢেলে দিয়ে বললে—কেমন ?

দিদি বললে—আচ্ছা।

কিন্তু চাবি চুরির সুযোগ সেদিন হ'লো না, মা মোটে ঘুমালেনই না সেদিন। তার পরের দিন বাবার আপিশের ছুটি, সবাই মিলে সিনেমায় যাওয়া হ'লো দুপুরবেলা। আর তার পরের দিন ছোটোপিসির নেমন্তন্ন, তাঁর চারটি ছেলেমেয়ে কী যে দুরন্ত, খেতে-খেতে দুটো বাজলো, দেখতে-দেখতে সন্ধে।

তিনু-মিনুর মন খারাপ হ'য়ে গেলো। ওরা ব'সে আছে তাদের আশায়—ঘোমটার তলায় বৌটির বুক কাঁপছে, সাঁওতাল ছেলেরা মাদল বাজিয়ে ডেকে-ডেকে সারা হ'লো, আগুন-রঙা বাঘ এক পা তুলে কান পেতে আছে—এত আশা, উৎসাহ, আনন্দ সবই কি ব্যর্থ হবে, আর কি পৌঁছতে পারবে না তারা ? ওরা কি চিরকাল বন্দী হ'য়ে থাকবে কাচের মধ্যে, চিরকাল রুদ্ধ থাকবে স্পর্শহীন অমরতায় ?

সেই রাত্রে ঘুমোবার আগে তিনু বললো, দিদি, কী ভাবছো ?

—ভাববো আবার কী।

দিদির কানের সঙ্গে মুখ ঠেকিয়ে তিন্নু বললো, চল না রাত্তিরে—মা-বাবা যখন ঘুমিয়ে পড়বেন—

—পাগল নাকি।

—আমাকে তুমি মাঝ-রাত্তিরে ডেকে দিতে পারবে?

—পারবো না কেন, কিন্তু আমিই যদি ঘুমিয়ে পড়ি?

—আচ্ছা, আমিই তা'হলে জেগে থাকি, আমিই ডেকে তুলবো তোমাকে।

—আচ্ছা আচ্ছা বীরপুরুষ, ব'লে মিনু ভাইয়ের চুল ধ'রে ঝাঁকানি দিলে।

কিন্তু সত্যই মাঝ-রাত্তিরে ঘুম ভাঙলো সেদিন। মা-বাবার চ্যাঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে তিন্নু বিছানা'য় উঠে বসলো—জানলা দিয়ে দেখতে পেলো ফ্যাকাশে চাঁদের আলো, শুনতে পেলো আকাশ ভ'রে সাইরেনের কান্না। মিনু তখন বিছানা ছেড়ে শাল জড়িয়ে তৈরি হ'য়ে নিয়েছে। মুহূর্তে ঘুম ছুটে গেলো তিন্নুর, লাফ দিয়ে নামলো খাট থেকে, দ্রুত নির্দয় সবল হাতে মা একটা পুল-ওভর গলিয়ে দিলেন তার গলায়—বাবা ঘাড়ে নিলেন লেপ-কম্বল, মা হাতে নিলেন তিন-চারটে বালিশ, মিনুর হাতে দিলেন ঘড়ি, টর্চ, চাবি, তারপর হুড়মুড় ক'রে সবাই নামলে নিচে, আলো জেলে বসলো বস্তা-চাপা প্রাণ-বাঁচানো ঘরে।

সাইরেন চুপ হ'লো, হঠাৎ নিথর নিস্তব্ধ হ'লো চারিদিক, শুধু মাথার উপরে একটা এরোপ্লেন ঘুরে-ঘুরে গুঞ্জনধ্বনি তুলে যেন রাত্রির হৃৎশব্দকে ঘরে-ঘরে প্রচার করছে। পাঁচ মিনিট—দশ মিনিট—পনেরো মিনিট কাটলো এইরকম, কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। তখন মা বললেন—বোমা না হাতি! মিছিমিছি এই শীতের মধ্যে বিছানা থেকে টেনে তুললো।

বলতে-বলতেই গুম ক'রে একটা শব্দ হ'লো। বাবা লাফিয়ে উঠে বললেন—ঐ তো! বোমা পড়ছে!

মা বললেন—সত্যি বোমা?

সঙ্গে-সঙ্গে পর-পর কয়েকটা শব্দ। এবার একটু জোরে। তারপর হঠাৎ অত্যন্ত জোরে এমন একটা শব্দ হ'লো যে সারা বাড়িটাই কেঁপে উঠলো। বাবা চীৎকার ক'রে উঠলেন, খুব কাছে পড়ছে। সাবধান! মিনু, তিনু, কাচের কাছ থেকে স'রেএসো।

কিন্তু মিনু তিনু কি আর এ-জগতে আছে। যে-মুহূর্তে তারা ঢুকতে পেয়েছে এ-ঘরে, দু'-জনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের স্বপ্নের সীমান্তে, স্বচ্ছ কঠিন হৃদয়হীন কাচের উপর চারটি উজ্জ্বল সজীব চোখের অপরিসীম ব্যাকুলতা প্রতিফলিত ক'রে, স্তব্ধ হ'য়ে তাকিয়ে-তাকিয়ে শুধু দেখেছে—আর কাচের ভিতরে সারিতে-সারিতে রেশমে-পশমে, কাঠে মাটিতে গাটাপার্চায় সে কী উতরোল কলরোল, সে কী উদ্দাম উল্লাস! এসো, এসো, এসো, সবাই মিলে পাগল হ'য়ে ডাকছে ওরা, এসো—ও—ও—ও—ও। থরথর ক'রে কাঁপছে কাচ, থরথর ক'রে কাঁপছে বাড়ি, পৃথিবী কাঁপছে, আকাশ কাঁপছে। অদম্য এই আবেগ, অসহ্য এই ইচ্ছা, আনন্দের উন্মত্ত চীৎকারে ভ'রে গেলো রাত্রি—তারা স্পর্শ চায়, সঙ্গ চায়, প্রাণ চায়, দুঃখ চায়, মৃত্যু চায়। এসো—ও—ও—ও—ও! এসো—ও—ও—ও—ও—ও—ও। সো—ও—ও—ও। শোঁ—ও—ও—ও—!

শোঁ—ও—ও ক'রে কী একটা লাগলো এসে দেয়ালে; মিনু-তিনু অবাক হ'য়ে বিস্ফারিত চোখে দেখলো ঝকঝকে মস্ত মোটা কাচ পাখা মেলে উড়ে চ'লে গেলো, আর ওরা সব নেচে-নেচে নেমে এলো, নেচে-নেচে, ঘুরে-ঘুরে, মাদলের সুরে-সুরে, বাঘ লাফ দিয়ে পড়লো কার্পেটের উপর, ভালুক গড়াতে লাগলো সোফায়, কুকুরটা ডিগবাজি খেতে-খেতে দরজার কাছে চ'লে গেলো—

ঘোমটা পরা বৌটি বুদ্ধের পায়ে প্রণাম ক'রে ঘোমটা খুলে উঠে দাঁড়ালো, আর টুকটুকে ডলটা ফুর্তির বেগ সামলাতে না-পেরে দেয়ালে মাথা ফেটে মারা গেলো। মিনু-তিনু নিজকে আর চেপে রাখতে পারলো না, হাতে-হাতে তালি দিতে-দিতে লাফাতে-লাফাতে চ্যাচাতে লাগলো—কী মজা! কী মজা! কী মজা!

—চুপ কর খোকারা! কেমন অদ্ভুত একরকম গলায় বাবা ব'লে উঠলেন, আর মা অত্যন্ত অসহায়ভাবে ব'লে উঠলেন—আমার আলমারি! আলমারিটা গেলো!

—তুমি চুপ করো তো! বাবা ধমকে উঠলেন। বাড়িতে বোমা পড়লো আর উনি এখন আলমারির জন্য শোক করতে বসলেন! কতদিন বলেছি ওটা ওখান থেকে সরাও—শোনোনি তো আমার কথা! কাচ বিঁধে ছেলে-মেয়ে দুটো যে আজ মরেনি এই অনেক ভাগ্যি!

সমস্ত ঘরে টুকরো-টুকরো কাচ ছড়ানো, দেয়ালে তীরের মতো কাচ বিঁধে আছে, কিন্তু একটি কণাও কারো গায়ে লাগেনি। বাবা নিশ্বাস ফেলে-ফেলে বার বার বলতে লাগলেন—উঃ, খুব বাঁচা গেছে, খুব বাঁচা গেছে, কিন্তু এদিকে তাকিয়ে ওদিকে তাকিয়ে মা কেবলই হায়-হায় ক'রে উঠতে লাগলেন, দুঃখে বুক তাঁর ফেটে যাচ্ছে।

মিনু-তিনুকে চুপ ক'রে ব'সে থাকতে হ'লো অসহ্য আনন্দ সংযত ক'রে। বাবা দু-হাত দিয়ে দু-জনকে চেপে ধ'রে আছেন, পাছে নড়াচড়া করতে গিয়ে পায়ে কাচ ফুটে যায়। বাবার হাত দুটি একটু কাঁপছে, মা-র মুখটা দেখাচ্ছে ঠিক প্রোমোশনের দিনে ফেল-করা ছাত্রের মতো—থেকে-থেকে চমকে-চমকে ওঁরা পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছেন, আবার বুঝি শব্দ হ'লো, বুঝি বাড়িটাই এবার ভেঙে পড়ে মাথার উপরে—মিনু তিনু স্পষ্ট বুঝতে পারছিলো যে তাঁদের চোখে আর প্রাণ নেই, দেহে আর বল নেই

বাপের দু'দিকে ব'সে-ব'সে মাঝে-মাঝে চোখোচোখি হচ্ছিলো ভাই-বোনের— মা বাবাকে অতিক্রম ক'রে দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়ছিলো সমস্ত ঘরে—ঐ তো ওরা, নাচে গানে খেলায় হল্লায় হাসিতে খুশিতে সমস্ত ঘর ভ'রে দিয়েছে; প্রাণ পেয়েছে ওরা, প্রাণ দিতে ওরা প্রস্তুত। আর ভয় নেই।

১৯৪৫

একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা

সকালবেলাটি জ্যোতির্ময় হ'য়ে দেখা দিলো। কাল রাত্রে যে বৃষ্টি হয়েছিলো আকাশে তার চিহ্নমাত্র নেই, বাতাসে আছে তার স্মৃতি। আজ আকাশ কূলে-কূলে নীল, কানায়-কানায় উজ্জ্বল, দিগন্ত থেকে দিগন্তে অবারিত। মস্ত নগ্ন উন্মুক্ত আকাশটার কোনোখানে এক ফোঁটা শাদা মেঘও লেগে নেই, তীব্র তপ্ত রোদ্দুরে পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে, সে-তাপে তেজ আছে, ক্লেশ নেই, কেননা হাওয়া এখনো গরম হ'য়ে উঠতে পারেনি, কালকের বৃষ্টির স্পর্শটুকু এখনো সে ছড়িয়ে দিচ্ছে পৃথিবী ভ'রে। আশার যদি কোনো রূপ থাকতো, উৎসাহের যদি কোনো ছবি হ'তো, এই সকালটি যেন তা-ই। গ্রীষ্মের যে-সাধনায় আমের বুক রসে ভ'রে ওঠে, তারই উদ্দীপনা এই রৌদ্রে, তারই প্রণয় এই হাওয়ায়। এ-রকম সকাল বছরে একটি-দুটির বেশি আসে না; বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের কোনো-এক অপ্রত্যাশিত তিথিতে হঠাৎ সে দিনের দিগন্তে এসে দাঁড়ায়—পৃথিবীর লোক বাজার করে, রান্না করে, আপিশে যায়, হয়তো ও-সব করতে সেদিন তাদের একটু বেশি ভালো লাগে, রাস্তায় বেরিয়ে হয়তো মনে হয়, 'বাঃ, বেশ!' রোগশয্যায় শুয়ে কেউ হয়তো ভাবে, 'আজ আমি ভালো আছি'—কেন ও-রকম হয় কেউ বোঝে না।

যে-কোনো শহরে, যে-কোনো ভিড়ে, যে-কোনো কলকারখানার নোংরামির মধ্যে এই সকালটি সুন্দর হ'তো, কিন্তু এর মদির আনন্দময় মূর্তিটি এমন পরিপূর্ণ ক'রে অন্য কোথাও কি প্রকাশিত হ'তে পারতো, যেমন হয়েছে এই ঢাকায়, পুরানা পল্টনে? শহরের বাইরে এই পাড়াটি নতুন গ'ড়ে উঠছে, এখনো চার-পাঁচখানার বেশি বাড়ি হয়নি, সবস্তটা দক্ষিণ জুড়ে প'ড়ে আছে বিস্তীর্ণ শুষ্ক প্রান্তর,—প্রান্তর শেষ হ'য়ে যেখানে পাড়া আরম্ভ, ঠিক সেখানটায় একটা উন্নত প্রশস্ত বলীয়ান বটগাছ অচল-চঞ্চলের মিলন-তোরণের মতো দাঁড়িয়ে; —উত্তর পুব গাছপালার গ্রাম্য উচ্ছ্বাসে ঘনশ্যামল, পশ্চিমে রমনার উপনগর—সে উপনগর না উপবন কে বলবে? এই আলো, এই আনন্দ,

এই অন্নপ্রাশনা শুধু যে বাইরে খোলা মাঠে আকাশের তলাতেই পরিব্যাপ্ত তা নয়, ঘরের মধ্যেও তার উল্লাস, তার নিশ্বাস, তার গন্ধ। পুরানা পল্টনের ঘরে-ঘরে আজ সকালবেলার সোনার প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত। বিশেষ ক'রে একটি ঘরে—ছোটো একটি একতলা বাড়ির ছোটো একটি ঘরের মধ্যে সারা আকাশ যেন গুনগুন ক'রে গান করছে। ঘরটি ছোটো হ'লেও তার পুবে-দক্ষিণে চার-পাঁচটা দরজা-জানলা খোলা, আলোর বান ডেকেছে, হাওয়া বইছে ঝিরিঝিরি, আর টেবিলে ব'সে একটি যুবক জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। দেখে বোঝা যায় সে সদ্য যুবক হয়েছে, উনিশের বেশি বয়স নয়, মুখখানা কমনীয়, ভারি-ভারি চোখ, বড়ো-বড়ো চুল। চুলের একটা গুছি কপালের উপর টেনে এনে সে এক আঙুলে জড়াচ্ছে আর খুলছে, আর সেই সঙ্গে গুনগুন ক'রে কী বলছে। অপরূপ সকালবেলাটির নীরব গুঞ্জন যেন ধ্বনি পেয়েছে, ভাষা পেয়েছে তার মুখে। টেবিলের উপর বইপত্রের ভিড়ের মধ্যে একটি শাদা পাথরের থালার উপর কয়েকটি রোদ্দুর রঙের চাঁপা, তাদের গন্ধও যেন এই রৌদ্রেরই ঘ্রাণরূপ। যুবকটির সামনে মোটা একখানা বই খোলা, কিন্তু বইয়ের দিকে তার চোখ নেই, বাইরের দিকে তাকিয়ে সে মৃদুস্বরে বলছে :

'There lived a singer in France of old
By the tideless dolorous midland sea,
In a land of sand and ruin and gold
There shone one woman—and none but she.

In a land of sand and ruin and gold—কী সুন্দর! কী সুন্দর!

And finding life for her love's sake fail,
Being fain to see her, he bade set sail,
Touched land—

আরে !'

কবিতার আবৃত্তিতে বাধা পড়লো, বাইরে শাদা ধুলোর কাঁচা রাস্তায় একখানা ঘোড়ার গাড়ি এসে থামলো। যুবকটি চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজার ধারে দাঁড়ালো, কিন্তু বাইরে গেলো না। গাড়ি থেকে সকলের আগে একটি বছর এগারোর মেয়ে লাফিয়ে নামলো, পরনে তার ফুটফুটে একটি ফ্রক, কিন্তু শিগগিরই তার আর ফ্রক পরা চলবে না। তারপর নামলো একটি ছেলে, তার বয়স পনেরো হবে কি ষোলো, কিন্তু হঠাৎ সে তার বয়স ছাড়িয়ে অনেকখানি লম্বা হ'য়ে গেছে। তারপর নামলেন একজন বর্ষীয়সী মহিলা, আর সকলের শেষে নামলো একুশ-বাইশ বছরের একটি মেয়ে, পরনে ফিকে নীল রঙের শাড়ি, হাতে দু-খানা বই। মেয়েটি নেমেই গাড়ির দরজার ধারে দাঁড়ালো, জানালা দিয়ে যুবকটির দিকে তাকালো একবার, সকলের শেষে নেমে বাড়িতে ঢুকলো সকলের আগে। সে কাছে আসতেই যুবকটির মুখে এক আশ্চর্য আভা ছড়িয়ে পড়লো, 'এসো—' এই একটুখানি কথায় সে স্যুইনবর্নের পুরো একটা স্তবকের আবেগ ঢেলে দিলে।

'বই দুটো রাখো, মাসিমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে আসি।' অন্যদের সঙ্গে মেয়েটিও চ'লে গেলো বারান্দা দিয়ে ঘুরে বাড়ির ভিতরে। যুবকটি ফিরে এসে আর বসলো না, চুল টানতে-টানতে পাইচারি করতে-করতে আবার কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলো। কয়েক মিনিট সে গুনগুন করলো, তারপর টেবিলের ধারে এসে বইখানা হাতে তুলে নিয়ে স্পষ্ট স্বরে পড়তে লাগলো—

'Wilt thou yet take all, Galilean? but these thou
shalt not take,
The laurel, the palms and the paean, the breasts
of the nymphs in the brake;
Breasts more soft than a dove's—'

—'মৌলি! আজ সকাল থেকেই তোমাকে কবিতায় পেয়েছে!'

মৌলি মেয়েটির দিকে একবার তাকিয়েই আবার কবিতা বলতে লাগলো, 'Breasts more soft than a dove's that tremble with tenderer breath, and all the wings of the Loves, and all the joy before death ;—চিত্রা! আমি পাগল হ'য়ে যাবো!'

চিত্রা তার কাছে দাঁড়িয়ে চোখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললে, 'তাতে আর আশ্চর্য কী আছে—জিনিয়সরা একটু পাগলই তো হয়।'

'শব্দে কী মোহ! ভাষায় কী জাদু! ছন্দে কী শক্তি! কবিতায় কী আনন্দ! চিত্রা, কবিতা যারা পড়ে না তারা কেমন ক'রে বাঁচে, আর কেনই বা বেঁচে থাকে?'

চিত্রা কিছু না-ব'লে মৌলির আলো-জ্বলা মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। মৌলি বলতে লাগলো, 'তার উপর ছাখো, কী সুন্দর আজ সকালবেলাটি। ঘুম ভেঙে যেই বাইরে তাকিয়েছি অমনি একটা সুখের ঢেউ যেন আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো। এই রকম আলো আর আকাশ, আর এই রকম সকালবেলা—জীবনকে পরিপূর্ণ করতে এর বেশি আর কী চাই! কিন্তু না—আরো আছে, আরো আছে জীবনে, তাই তো তুমি এলে। এত সুখ আমি কেমন ক'রে সইবো?' যেন সত্যিই সুখের ভারে অভিভূত হ'য়ে মৌলি পুব-দক্ষিণের দুটো জানলার মাঝখানে রাখা ইজি-চেয়ারটিতে ব'সে পড়লো।

চিত্রা বললে, 'বাঃ, আমি যে ভেবেছিলাম ওটায় বসবো।'

'তুমি বসবে?' মৌলি এক লাফে উঠে দাঁড়ালো, তারপর বাইরের দিকে একবার তাকিয়ে বললে, 'গাড়িটা রেখে দিয়েছো যে? এক্ষুনি যাবে নাকি?'

'তোমদের পাড়ায় গাড়ির যা অসুবিধে—রেখে দেয়াই ভালো।'

মৌলি টেবিলের ধারে চেয়ারটিতে বসলো। যে-বই দু'-খানা চিত্রা হাতে ক'রে এনেছিলো তার উপরেরটির মলাট উলটিয়ে বললে, 'পড়লে?'

'পড়লাম—ভালো বুঝলাম না।'

'বোঝবার আবার কী আছে।'

'এম. এ. পরীক্ষাটাকে এখন একটা সমুদ্রের মতো লাগছে—কোনোদিকেই কূল দেখতে পাচ্ছি না।'

'কী যে বলো! এ তো ছেলেখেলা!,

'তোমার কাছে ছেলেখেলা, মৌলি, কিন্তু—'

'তুমি চুপ করো তো! এতই যদি তোমার ভয়, আমার কাছে আসো না কেন রোজ, আমার সঙ্গে পড়লে তোমার কিছু কষ্ট হবে না—দেখবে কত ভালো লাগে—'

'এত দূর কি রোজ-রোজ আসা যায়!'

'দূর আর কী। ইচ্ছে করলেই পারো। বললে ভালো শোনায় না, কিন্তু আমি যা বুঝি প্রোফেসররাও তা বোঝেন না, চিত্রা। তাঁদের বিদ্যে অনেক, বুদ্ধিও কম না—কিন্তু তঁদের মন নেই, প্রাণ নেই, কল্পনা নেই, আনন্দ নেই, কবিতা প'ড়ে আত্মহারা হ'তে জানেন না তাঁরা। আর আত্মহারা যে না হয়, সে কেন কবিতা পড়ে।'

'অনেক লোক দেখেছি, মৌলি, তোমার মতো কবিতা-পাগল আর দেখিনি।'

'তুমি হয়তো আর গ্যাখোনি, কিন্তু আছে। রাসীনের দুটি লাইন শুনে থিয়েটারের বক্সে ব'সে স্তু মুসে অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলেন। পদ্য লিখলেই কবি হয় না, বক্তৃতা করলেই যোদ্ধা হয় না। এই প্রাণ যার আছে, সেই তো কবি, সেই তো গুরু—তার কাছেই আমরা শিখবো।'

'তোমার আর আমার এক পথ নয়, মৌলি। তুমি প্রতিভা দিয়ে যা পারো, আমাকে সেটা খাটুনি দিয়ে পুষিয়ে নিতে হয়। খাটুনির পথপ্রদর্শক তাঁরাই হ'তে পারেন, নিজেরা যাঁরা খেটেছেন। সেইজন্তই মাঝে-মাঝে মহেন্দ্রবাবুর

কাছে গিয়ে বসি।'

'মহেন্দ্রবাবু! ঐ নীরস নীবক্ত নিষ্প্রাণ নির্জীব মনুষ্যাকৃতি জড়পদার্থের কাছে তুমি পড়তে যাও!'

'উনি বাড়ির কাছে থাকেন—'

'বাড়ির কাছে যদি বকধার্মিক বসে তাকেই পুজো করবে তুমি? তাহ'লে আর সাহিত্যকে তীর্থযাত্রা বলেছে কেন? এর জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে হয়, দুঃখ পেতে হয়, খাটতে হয়—অবশ্য সে-খাটুনি তোমার মহেন্দ্রবাবুর জাতের নয়!'

'তা তুমি যা-ই বলো, মহেন্দ্রবাবু বেশ পরীক্ষার মতো ক'রে পড়াতে পারেন।'

'তা পারবেন না! এই দু-বছর ভ'রে ওঁর লেকচার শুনলাম, এর মধ্যে এমন একটা কথা শুনলাম না যা মনের কোনো-একটা শিখায় মুহূর্তের জন্যও আগুন ধরিয়ে দিলো। উঃ—কী যন্ত্রণা এ-সব লোকের লেকচার শোনা!'

'তা সকলে কি আর সব পারে।'

'না-ই যদি পারে তাহ'লে লোকের চোখে সাহিত্যের পণ্ডিত হবার স্পর্ধাই বা কেন? ইকনমিক্স কী-দোষ করেছিলো? আমি তোমাকে বারণ ক'রে দিচ্ছি, মহেন্দ্রবাবুর কাছে আর যেতে পারবে না।'

এ-কথার উত্তরে চিত্রা কিছু বললো না। ধবধবে কাপড় পরা একজন বিধবা মহিলা ঘরে এলেন চায়ের ট্রে নিয়ে। চিত্রা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে ট্রে-টি তাঁর হাত থেকে নিয়ে টিপয়ের উপব রাখলো। শাদা পেয়ালার উপর রোদের একটি রেখা প'ড়ে চিকচিক ক'বে উঠলো, তোস-রুটি আর মাখনের একটি সূক্ষ্ম সুস্থ গন্ধ মুহূর্তের জন্য ঘ্রাণ-গোচর হ'য়েই পরিব্যাপ্ত গ্রীষ্ম-সৌরভের মধ্যে মিলিয়ে গেলো।

মৌলি বললে, 'মা, আজ ডিম নেই?'

'না, ডিমওলা কাল আসেনি তো—'

'সকালে আমার ডিম ছাড়া কিছু খেতে ইচ্ছে করে না।'

'রাখুকে পাঠিয়েছি বাজারে—'

'সে আসতে-আসতে কি আর ডিম খাওয়ার ইচ্ছে থাকবে আমার। যাকগে, আজ রুটি-মাখনই খাওয়া যাক।'

মৌলির মা চিত্রার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখানে এমন অসুবিধে জিনিশপত্র পাওয়ার—বাজার সেই দু-মাইল দূরে—'

চিত্রা একটু হেসে বললে, 'না মাসিমা, আপনি আদর দিয়ে-দিয়ে ছেলেকে একেবারে নষ্ট করেছেন।'

উপুড়-করা পেয়ালা দুটো ট্রের উপর সোজা ক'রে বসিয়ে মা বললেন, 'চিত্রা, তুমি তাহ'লে চা-টা ঢালো—আমি যাই, তোমার মা একা আছেন।' দরজার কাছে একটু দাঁড়িয়ে আবার বললেন, 'তোমরা খাও, কেমন?'

চা ঢালতে-ঢালতে চিত্রা বললো, 'আশ্চর্য মা তোমার!'

'সব মা-ই আশ্চর্য।'

'না, সব মা এক রকম হয় না। আর এই মা-র উপর কী অত্যাচারই তুমি করো!'

'অত্যাচার করি!' মৌলি হেসে উঠলো।

'তুমি অবশ্য তা বোঝো না—কিন্তু অত্যাচারই তুমি করো। দাসীর মতো ব্যবহার করো তাঁকে।'

'আমাকে মন্দ বলবে ব'লেই এ-সব বলছো।'

'আচ্ছা, এ-কথা কি ঠিক নয় যে সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত তোমারই খাওয়া পরা শোওয়া, তোমারই সুখ সাচ্ছন্দ্য আরাম নিয়ে তিনি ব্যস্ত থাকেন? আর তার একটু উনিশ-বিশ হ'লে তোমার বরদাস্ত হয় না?'

মৌলি চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, 'ও, ঐ ডিমের কথাটা বললাম ব'লে বলছো? তা রোজ সকালে একটা ডিম কি খুব বেশি চাওয়া?'

'না, না, ওটা তোমার স্বভাব। তুমি জানো না যে তোমাকে যে ভালোবাসে তার কাছ থেকে তুমি চরম আদায় ক'রে নাও, বিনিময়ে কিছুই প্রায় দাও না।'

মৌলি রুটিতে কামড় দিতে গিয়ে প্রায় থেমে গেলো। চিত্রার দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললে, 'ভালোবাসায় দান-প্রতিদানের কথা ওঠে না, চিত্রা।'

'বিনিময় ছাড়া ভালোবাসা হয় না।'

'তাহ'লে আমিও বিনিময় করি নিশ্চয়ই—কিন্তু আমি যা দিই, তার মূল্য লোকের চোখে ধরা পড়ে না। আমার টাঁকশালে অন্য রাজার ছাপ।'

'আচ্ছা, তুমি কি কখনো তোমার মা-র সুখদুঃখের কথা ভাবো?'

'সত্যি যদি জানতে চাও তাহ'লে বলি যে আলাদা ক'রে মা-র কথা ভাববার সময়ই হয় না আমার।'

'অথচ মা-কে কাছ-ছাড়া করতেও তোমার আপত্তি?'

'সে-কথাও ঠিক।'

'তিনি স্ত্রীলোক—অথচ সমস্ত সংসারটি তিনিই চালান। তুমি কি একদিনের জন্যও বাজারে গিয়েছো, না একজোড়া কাপড় কিনে এনেছো, না কি কোনোদিন মুদি বা গয়লা বা কয়লাওয়ালার সঙ্গে একটা কথা বলেছো! তোমার চুল ছাঁটবার নাপিত পর্যন্ত তোমার মা ডেকে দেন।'

'ও-সব কাজ আমার নয়, চিত্রা, আমি অন্য কাজের জন্য জন্মেছি। বছরে এক-আধবার জুতো কিনতে দোকানে যেতে হয়, সেটাই আমার যথেষ্ট খারাপ লাগে।'

'তোমার জন্য চিরকাল কে এ-সব করবে তা একবার ভাবো?'

'কেউ-না-কেউ করবেই।'

'বুঝেছি। একদিকে তুমি যেমন জন্ম-পণ্ডিত, আর-একদিকে তুমি তেমনি চিরশিশু। তোমার মা তোমাকে সেইভাবেই রাখেন। এখন বেশ চলছে—কিন্তু বিয়ে করলে স্ত্রীকে তুমি সুখী করতে পারবে না, মৌলি।'

চিত্রার দিকে একটি দীর্ঘ দৃষ্টিপাত ক'রে মৌলি আস্তে-আস্তে বললে, 'না-হয় অসুখী হ'লেই। ভালোবাসা একটা প্রচণ্ড শক্তি—সেটা যে একান্তই সুখের নয় তা কি তুমিও জানো না?'

চিত্রার চোখ মৌলির চোখের সঙ্গে কয়েক মুহূর্ত মিলিত হ'য়ে রইলো, তারপর সে চোখ নামিয়ে নিলে।

সেই ফ্রক পরা মেয়েটি আর ষোলো বছরের ছেলেটি এলো ঘরে। তাদের লক্ষ্য না-ক'রে মৌলি বললে, 'মহেন্দ্রবাবুর কাছে তুমি পড়তে যাও—আমাকে তো তার কিছুই বলোনি।'

'সব কথাই বলতে হবে নাকি তোমাকে?'

'এটা তো গোপনীয় কিছু নয়।'

চিত্রা তার ভাই-বোনের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ওরা দু-জন এসে বেচারা-মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে— একবার তো বসতেও বলতে পারো।'

মৌলি তাড়াতাড়ি বললে, 'বোসো, গীতা। বোসো, বেণু।'

বেণু মোটা গলায় বললে, 'আমি একবার তারকদের বাড়িতে ঘুরে আসি—এক্ষুনি যাবে না তো, দিদি?' মৌলির সঙ্গে কোনোরকমে চোখে-চোখে একটা সম্ভাষণ সেরে বেণু ছুটে পালিয়ে গেলো।

মৌলি গীতার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমার কোনো বন্ধু-বান্ধব নেই পাড়ায়?'

গীতা ঘাড় হেঁট ক'রে চুপ ক'রে রইলো।

'তুমি ফুল ভালোবাসো? এই নাও—' টেবিলে মাটির থালা থেকে একটি

চাঁপা ফুল তুলে মৌলি গীতার হাতে দিলে; ফুল নিয়ে গীতা টিপি-টিপি পায়ে বেরিয়ে গেলো। চিত্রা বললে, 'বেচারারা। মায়েদের তাড়া খেয়ে এলো এখানে, এখানে এসেও তাড়া খেলো। গীতার সঙ্গে দু-একটা কথা অন্তত বলতে পারতে। ওর খুব ইচ্ছে তোমার কাছে আসে—সাহস পায় না।'

'কী যেন। বাচ্চাদের সঙ্গে ভাব জমাতে একেবারে পারি না আমি।'

'ও মা! গীতা আবার এমন বাচ্চা কী। আর দু-দিন পরেই শাড়ি ধরবে, তোমার মতো কত যুবকের বুকে ঢেউ তুলবে তখন।'

মৌলি অত্যন্ত গম্ভীর হ'য়ে বললে, 'তোমার এ-সব ঠাট্টা ভালো লাগে না আমার।'

'তুমি কি জানো যে গীতা তোমার ভীষণ ভক্ত? তোমার সব কবিতা ওর মুখস্থ।'

'তা-ই নাকি?' মৌলির কণ্ঠস্বরে উৎসাহ নেই।

'এত যে অবজ্ঞা করো ওদের, তোমার নিজের বয়সটাই বা কী?'

'বয়স আয়ুর অঙ্কে হয় না, চিত্রা, বয়স মানুষের মনে। আমারও ষোলো বছর বয়স ছিলো, কিন্তু আমি বেণুর মতো ছিলাম না। কোনোদিনই ও-রকম ছিলাম মনে করতে পারি না।'

চিত্রা নিঃশব্দে কয়েক চুমুক চা খেলো। তারপর একটু যেন চেষ্টা ক'রে একটু যেন হঠাৎ বললে, 'তোমাকে একটা কথা জানানো দরকার, মৌলি।'

'কী বলো তো?'

'এম. এ. পরীক্ষা আমি দেবো না।'

'কেন?' মৌলি চমকে উঠলো।

'কী আর হবে। আমি অত্যন্ত সাধারণ—আমার কিছু হবে না, মৌলি।'

'এতদূর অগ্রসর হ'য়ে পরীক্ষার দেড় মাস আগে তুমি স্থির করলে যে

তোমার কিছু হবে না?'

চিত্রা চুপ ক'রে রইলো।

'হওয়া বলতে তুমি কী বোঝো, শুনি?'

'তুমিই বলো, সাধারণভাবে পাশ করা আর পাশ না-করার বিশেষ কি কোনো তফাৎ আছে?'

'খুব ভালো পাশ-করা মূর্খও কি তুমি ছাখোনি?'

'তা তুমি যতই তর্ক করো, আমি মনস্থির ক'রে ফেলেছি।'

'কী-সব বাজে কথা বলো, ভালো লাগে না আমার,' মৌলি চায়ের পেয়ালা মুখে তুলতে গিয়েই নামিয়ে রাখলো। চিত্রা তার পেয়ালায় আর-একটু চা ঢেলে দিয়ে দুধ-চিনি মেশাতে-মেশাতে বললে, 'বিশ্ব-জগৎ তোমার ভালো-লাগা অনুসারেই চলবে, সেটাই বা আশা করো কেন?'

'বিশ্ব-জগতের কথা নয়;—তুমি নিশ্চয়ই এমন কিছু করবে না, যা আমার ভালো লাগে না।' কথাটা প্রশ্নের স্বরে বললো না মৌলি, এতটুকু সংশয় প্রকাশ পেলো না, একান্ত বিশ্বাস, পরিপূর্ণ নির্ভর ছাড়া কিছুই ছিলো না তাতে। তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চিত্রার মুখটি একটু ম্লান হ'য়ে গেলো। মৃদু স্বরে বললে, 'আমাকেই বা এত বিশ্বাস কিসের।'

পিছন দিকে মাথা হেলিয়ে হো-হো ক'রে হেসে উঠলো মৌলি। টেবিলের গায়ে পা ঠেকিয়ে চেয়ারটি একটু উঁচু ক'রে আস্তে দোলাতে-দোলাতে বললে, 'কাল যা একটা মজার কথা শুনলুম!' ব'লে আবার হাসলো।

'শুনি মজার কথাটা?'

'তোমার নাকি বিয়ে ঠিক হয়েছে—আর তাও কার সঙ্গে জানো?—মহেন্দ্রবাবু, প্রোফেসর মহেন্দ্র ঘোষের সঙ্গে!' বলতে-বলতে হাসতে-হাসতে মৌলি চেয়ার উল্টিয়ে চিৎপাত হ'য়ে পড়েছিলো প্রায়—হাত

বাড়িয়ে কোনোরকমে টেবিলটা ধ'রে ফেলে রক্ষা পেলো। চিত্রা সে-হাসিতে যোগ দিলো না, তার মুখের উপর আর-একটু গাঢ় হ'লো ছায়াটি। জিগেস করলে, 'তুমি কী বললে?'

'আমি আর কী বলবো। মা তো আর জানেন না--জানেনই বা না কেন দু-বছর ধ'রে তোমাকে আমাকে দেখছেন, ওঁর বোঝা উচিত।'

'কী বোঝা উচিত?'

'তোমার সম্বন্ধে আমার মনোভাব আমি তো কখনোই গোপন করার চেষ্টা করিনি।'

একটু চুপ ক'রে থেকে চিত্রা বললে, 'আচ্ছা মৌলি, আমি যদি তোমাকে বলি যে কথাটা সত্যি।'

'তাহ'লে আমি বলবো যে তুমি মিথ্যে বলছো।'

চিত্রা এলানো ভঙ্গি থেকে সোজা হ'য়ে উঠে ব'সে বললো, 'না মৌলি, কথাটা সত্যি।'

মৌলি সস্নেহে বললে, 'তুমি কি আজ পাগল হ'লে?'

'এখন বিশ্বাস করো আর না-ই করো—দেখবে দু-দিন পরে।'

মৌলি উঠে দাঁড়িয়ে চিত্রার চেয়ারের পিছনে দাঁড়ালো। নিচু হ'য়ে তার মাথার উপর একবার হাত রেখে বললে, 'বাড়ির লোক জবরদস্তি করছে বুঝি খুব? তা ভয় কী আমাদের। আর ক-দিন পরেই এম. এ. পাশ ক'রে বেরোবো আমরা—'

'তুমি বেরোবে—আমি না।'

মৌলি হেসে বললে, 'আচ্ছা, আচ্ছা, আমি বেরোলেই চলবে। তারপর এখানকার ইউনিভার্সিটিতে একটা লেকচারশিপ তো আমার বাঁধা—কিন্তু সেটা আমি খুব সম্ভব নেবো না। এ ক-বছর প্রোফেসরদের বুলি শুনে-শুনে মাস্টারির উপর অশ্রদ্ধা জ'ন্মে গেছে আমার। আমি কবি,

আমি সাহিত্যিক—তা ছাড়া আর-কিছুই আমার হ'তে ইচ্ছে করে না।'

'তুমি কোন দুঃখে মাস্টারি করবে, মৌলি—শালগ্রামশিলা কেউ কি শিলনোড়ার কাজে লাগায়।'

চেয়ারের পিছন থেকে স'রে এসে চিত্রার সামনে পা রাখবার ছোটো মোড়াটায় ব'সে পড়লো মৌলি। গভীর আবেগের সঙ্গে বলতে লাগলো, 'আমার উপর ঈশ্বরের অসীম দয়া, আমি কবি হ'য়ে জন্মেছি; আমার মনে সেই আগুন জ্বলছে যে-আগুন কখনো নেবে না; এই আশ্চর্য সুন্দর পৃথিবী আমাকেই তিনি দিয়েছেন, সকাল, বিকেল, দুপুর, রাত্রি; গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর শরৎ; জলের স্নেহ, হাওয়ার প্রণয়, মেঘের লীলা—কোনো-একটি মুহূর্ত অন্য-কোনো মুহূর্তের মতো নয়—এই বৈচিত্র্য, এই ঐশ্বর্য, এই অন্তহীন আনন্দ না-চাইতে আমি পেয়েছি—যদি একশো বছর বাঁচি, চিত্রা, তবু আমি কখনো ক্লান্ত হবো না, তবু পুরোনো হবে না এই পৃথিবী, তবু শেষ হবে না আমার বেঁচে থাকার আবেগ।'

চিত্রা দুই মুগ্ধ চোখ মেলে মৌলির দিকে তাকিয়ে রইলো। যেন অনেকটা আপন মনে বললে, 'ধন্য তোমার জীবন।'

'নিশ্চয়ই! আমি ধন্য! আমার জীবন ধন্য! সেইজন্যই তো সমস্ত পৃথিবীকে পেয়েও পাওয়া আমার পূর্ণ হ'লো না, জীবনের আরম্ভেই তোমাকে পেলাম। তোমাকে যদি না পেতাম, তাহ'লে কি এত ভালো লাগতো জীবন, এত সুন্দর লাগতো পৃথিবী? তুমি জীবনের ছন্দ, নানা উপকরণের ভাষাকে তুমি প্রাণ দিয়েছো, গতি দিয়েছো, বস্তুকে করেছো সুর; তথ্যকে করেছো কবিতা। কবি যেমন ছন্দ দিয়ে অন্তরতমকে পায়, তোমাকে দিয়ে বিশ্বকে পেয়েছি আমি। বিধাতা কোনোখানে কার্পণ্য করেননি, দু-হাতে ঢেলে দিয়েছেন আমাকে—আমার সমস্ত জীবন ভ'রে আশা করি এইটে আমি প্রমাণ করতে পারবো যে তিনি অযোগ্যকে দেননি।'

'অযোগ্য তুমি নও, মৌলি, অযোগ্য আমি। সত্যি ক'রে বলো তো, তোমার এ-সব কথা কি আমাকে বলা, না তোমারই মনের কোনো কল্পনাকে?'

'তোমাকে, চিত্রা, তোমাকেই। এখনো তোমার সংশয়?'

'না মৌলি, এ তোমার ভুল। মনে-মনে তুমি একজনকে ভাবছো, আমি কাছে আছি ব'লে আমাকেই মেলাচ্ছো তার সঙ্গে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, এতদিন পরে তোমার কাছে আর শিখতে হবে না আমাকে,' ব'লে মৌলি হাসলো।

চিত্রা মাথা নেড়ে বললে, 'সে আমি নই, সে আমি নই। তোমার মা ভুল বলেননি, মৌলি।'

'এ-সব ঠাট্টা কী ক'রে মুখে আনো জানি না।'

'ঠাট্টা নয়, ঠিক কথা।'

মৌলি দুই চোখ বড়ো-বড়ো ক'রে বললে, 'সত্যি?'

'সত্যি।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

'ঐ মহেন্দ্রবাবুকেই—'

'হ্যাঁ।'

মৌলির মুখ থেকে সমস্ত আলো আস্তে-আস্তে নিবে গেলো। দু-হাতে মুখ ঢেকে চুপ ক'রে রইলো সে। চিত্রা হাত বাড়িয়ে তার মাথার চুল ধ'রে ঝাঁকুনি দিয়ে ডাকলো, 'মৌলি।'

মৌলি মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে তাকালো। সে-মুখ নীল হ'য়ে গেছে, নাসারন্ধ্র একটু স্ফীত, চোখের কোণে লাল-লাল ছিটে। স্নেহে ছলছল ক'রে উঠলো চিত্রার চোখ, খুব নিচু গলায় বললে, 'মৌলি, রাগ করলে?'

'আমি এতদিন ধ'রে যা ভেবেছি সবই তাহ'লে মিথ্যে ?'

'তুমি যা ভেবেছো—তুমি কি জানো না তা অসম্ভব ?'

'আমার কাছে সেটাই একমাত্র সম্ভব—ছিলো।'

'আমি তোমার বয়সে বড়ো।'

'দু-তিন বছরের বড়োকে বড়ো বলে না।'

'তুমি পুরুষ, আমি মেয়ে।'

'তা না-হ'লে তো এ-সব কথাই উঠতো না!'

'আমি মেয়ে ব'লেই তোমাকে ছেলেমানুষ ছাড়া কিছুই ভাবতে পারি না।'

মৌলির চোখে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেলো। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'কী বললে ?'

চিত্রাও উঠে দাঁড়ালো সঙ্গে-সঙ্গে। মৌলি দু-পা পিছনে স'রে গিয়ে গর্জন ক'রে উঠলো, 'আমি ছেলেমানুষ!'

'তুমি অসাধারণ, তুমি প্রতিভাবান, তুমি অনেক বিষয়ে আমার অনেক বড়ো—কিন্তু তুমি যে ছেলেমানুষ সে-কথাও তো সত্য,' বলতে-বলতে চিত্রার কণ্ঠস্বর ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো। 'আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি বলতেও বাধে না, কিন্তু তোমাকে স্নেহও করি, মৌলি। তুমি যদি কোনোদিন পৃথিবীতে কোনো মন্ত্র প্রচার করো আর তখনও যদি আমার এ-মন থাকে, আমি তোমারই শিষ্য হবো, দীক্ষা নেবো তোমারই কাছে—তোমাকে গুরু ব'লে মানতে এখনও আমার আপত্তি নেই—কিন্তু সংসারের ক্ষেত্রে তুমি ছেলেমানুষ, তুমি আমার স্নেহের পাত্র—সেখানে, তুমি যা ভেবেছিলে তা হ'তে পারে না, তা হবার নয়।'

চিত্রা যখন কথা বলছিলো মৌলির নিশ্বাস পড়ছিলো জোরে-জোরে, ঠোঁট দুটি ঈশৎ খুলে গিয়েছিলো, কপালে ফুটেছিলো ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম। শূন্য দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইলো, যেন সামনের মানুষটিকে

চিনতে পারছে না। চিত্রা আবার বললে, ‘এখনকার মতো তুমি হয়তো খুব কষ্ট পাবে, মৌলি, কিন্তু আর-কিছুদিন পরে বুঝতে পারবে এ-ই ভালো হ’লো। আমি তোমার চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষ—আমাকে দিয়ে মন ভরতো না তোমার। তোমার মতো যারা কল্পনাপ্রবণ তারা অল্প বয়সেই কোনো-না-কোনো মেয়ের সঙ্গে, যে-কোনো মেয়ের সঙ্গে নিজেকে এইরকম ক’রে যুক্ত করে, সেটা তাদের মনের খাদ্য। কিন্তু কিন্তু সেই ছেলেমানুষি যখন কেটে যায়—’

মৌলি বিকৃত ব্যথিত নিপীড়িত কণ্ঠে ব’লে উঠলো, ‘চুপ করো! চুপ করো তুমি।’

পাশের ঘর থেকে চিত্রার মা ডাকলেন, চিত্রা!’

‘যাই, মা!’ চিত্রা তাড়াতাড়ি মৌলির কাছে এগিয়ে এসে বললে, ‘যাই।’

মৌলি মুখ ফিরিয়ে রইলো।

‘আমি যাই তবে।’

মৌলি চুপ।

‘একবার তাকাবেও না?’

হঠাৎ তীব্র চাপা স্বরে মৌলি ব’লে উঠলো, ‘যাও, যাও! জীবনে আর তোমার মুখ দেখতে চাই না আমি।

সকালবেলাটি তবু সুন্দর, তখনও সুন্দর। মাঠের মধ্যে বটগাছটার অসংখ্য পাতাগুলি ঝরঝর করছে হাওয়ায়, ঝলমল করছে রোদ্দুরে—বেগুনি সোনালি শাদা, হলদে নীল সবুজ, নানা রঙের ঢেউ উঠছে, ঢেউ পড়ছে। সেই বটগাছের ধার দিয়ে বেঁকে গিয়ে ঘোড়ার গাড়িটি পাকা রাস্তায় পড়লো নীল শাড়ির আভাসটুকু আর দেখা যায় না। মৌলি মূর্তির মতো দাঁড়িয়েছিলো দরজার ধারে, এইবার আস্তে-আস্তে ফিরে এসে চেয়ারটিতে বসলো, উপুড়-করা

বইখানা তুলে আবার গুনগুন করতে লাগলো :

> 'I will go back to the great sweet mother,
> Mother and lover of men, the sea.
> I will go down to her, I and none other,
> Close with her, kiss her and mix her with me.
> Cling to her, strive with her, hold her fast,
> O fair white mother—'

কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে এলো, আর পড়া হ'লো না। মৌলি দু-হাত দিয়ে বইখানা জড়িয়ে বইয়ের ঠাণ্ডা পাতার মধ্যে মুখ ঢাকলো।

২

দশ বছর পরে আষাঢ়ের এক অপরাহ্ণ সেই পুরানা পল্টনেই ছায়াচ্ছন্ন হ'য়ে নেমে এসেছে। এতদিনে আরো অনেক বাড়ি উঠেছে পাড়ায়, রাস্তায় অ্যাসফল্টের প্রলেপ পড়েছে, মোড়ে-মোড়ে বিজুলি আলো, ঘরে-ঘরে রেডিও। এই ফিটফাট ছিমছাম ডেপুটি-মুন্সেফ-প্রোফেসরের বসতির মধ্যে মৌলিনাথের ছোটো একতলাটি অত ভালো আর দেখায় না, একটু গরিব-গরিবই দেখায়। প্রকাণ্ড একটা দোতলা বাড়ি তার পুবটাকে খেয়েছে, ভাগ্যক্রমে দক্ষিণটা এখনো আছে অবাধ। সেই দক্ষিণটাকে আশ্রয় ক'রেই জানলার ধারে ইজি-চেয়ারে সে ব'সে আছে। সেই ইজি-চেয়ার, চিত্রা যেটায় বসেছিলো। ঘরের অন্যান্য জিনিশপত্রও বিশেষ বদল হয়নি, বেড়েছে শুধু বইয়ের আর বইয়ের আধারের সংখ্যা—দুটো আলমারি আকণ্ঠ ঠাশা, ছোটো-বড়ো নানা আকৃতির কয়েকটা শেলফ বইয়ের চাপে ফেটে পড়ছে—তাতেও সব ধরেনি, টেবিলে বিছানায় মেঝেতে বইয়ের ছড়াছড়ি। ঘরের দেয়াল একটু বিবর্ণ, আসবাব

একটু মলিন, অত্যন্ত বেশি বই আছে ব'লে ঘরটি যত না ছোটো তার চেয়েও ছোটো দেখায়।

মৌলির হাতে একখানা বই, কিন্তু তাব চোখ বাইরের দিকে। আকাশে পরতে-পরতে মেঘ জমছে, শাদা মেঘের উপর ধোঁয়াটে মেঘ, ধোঁয়াটের উপর নীল, নীলের উপর কালো। হাওয়া বন্ধ, বটগাছটা ছবির মতো স্তব্ধ, সমস্ত পৃথিবী বর্ষণের প্রতীক্ষায় রুদ্ধশ্বাস।

ডাকেব চিঠি হাতে ক'বে মৌলির মা ঘরে এলেন। চিঠিগুলোব দিকে একবাব তাকিয়েই মৌলি হাতের বইখানার ভিতরে রেখে দিলে। মা বললেন, 'চিঠিগুলো প'ড়ে ছাখ—শেষটায় ভুলেই যাবি।'

'এ-সব বা'জে চিঠি এখন পড়তে পারবো না, মা।'

'হযতো কাজের চিঠিও আছে।'

'কাজের চিঠিকেই আমি বাজে চিঠি বলি।'

'চিঠি লিখে জবাব না-পেলে লোকে নিন্দে করে।'

সে-কথার জবাব না-দিয়ে মৌলি বললে, 'শুনেছো মা, পাড়াব কর্তারা ম্যুনিসিপ্যালিটিতে লেখালেখি ক'রে বটগাছটা কাটিয়ে ফেলছেন।'

'শুনছি তো।'

'এখানে আর এক মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে করে না আমার। দম আটকে আসে।'

ছেলের মুখের দিকে তাকিযে মা চুপ ক'রে রইলেন।

'পাড়ার এই ভদ্র ভাবটা বীভৎস লাগে আমার। এখানে আর বেশিদিন থাকলে আমি ম'রে যাবো।'

'আমি তো কবে থেকে বলছি যে কলকাতায় যদি কোনো সুবিধে হয়—'

'সুবিধে মানে তো চাকরি? চাকরির আবার এখানে আর ওখানে কী।'

'কেন, প্রোফেসরি তো ভালোই।'

'যা কখনো ভাবিনি, তা-ই হ'লো—দশ বছর ধ'রে সেই মাস্টারিই করছি। দশ বছর! ভাবতে পারি না। আমার জীবনে কিছুই হ'লো না, মা।'

'ছেলের আর হয় না! পাশ করার সঙ্গে-সঙ্গে ডেকে নিয়ে চাকরি দিয়েছে সে-কথা একবার ভাবিস? শুধু কি তা-ই, সারা দেশে কে না তোর নাম জানে আজ? এত অল্প বয়সে এতখানি নাম আর কার হয়েছে, শুনি?'

'অন্য কারো সঙ্গে আমার তুলনা কোরো না, মা। সেটা আমার সবচেয়ে খারাপ লাগে।'

'কেন, তুই কি মানুষ ছাড়া?'

'তা নই ব'লেই তো খ্যাতিতে কোনো সুখ নেই। বয়স যখন অল্প ছিলো, যখন দশ বছর বয়সে শেক্সপিয়র তর্জমা করেছি, তেরো বছরে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় এমন খাতা লিখেছি যে পাদ্রি পরীক্ষক ভেবে পাননি ছেলেটি জিনিয়স না উন্মাদ, সতেরো বছরে কবিতা লিখেছি, যা প'ড়ে মহিলারা বলেছেন আমাকে আঁতুড়ঘরে মেরে ফেলা হয়নি কেন—তখন আমি ছিলাম সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র, আমার তুল্য কেউ ছিলো না, তোমরা ভেবে পেতে না বড়ো হ'য়ে আমি কী হবো। আর আজ—আরো কত লেখক আছে যাদের সঙ্গে আমার নাম এক নিশ্বাসে উচ্চারিত হয়। আমাকে লোকে ভালোই বলে, কিন্তু এ-কথা আর বলে না যে এ-রকম আর হয় না! সেইজন্য খ্যাতি আমাকে কোনো সুখ দেয় না, মা।'

'যত অদ্ভুত কথা তোর! দশজনের একজন হওয়াটা কি কম কথা!'

'হ্যাঁ—দশজনের একজনই আমি হয়েছি, অনেকের মধ্যে মিশে গেছি আমি

কিন্তু আমি তো তা চাইনি, আমি চেয়েছিলাম একজনের একজন হ'তে। আমি তো মনে-মনে জানি যে আমার সমকক্ষ আর-কেউ নয়। কিন্তু কবে আমি তা প্রমাণ করতে পারবো? হয়তো কোনোদিনই পারবো না। পুরানো পল্টনের একজন গণ্যমান্য ভদ্রলোক হ'য়েই কাটবে আমার বাকি জীবন। গণ্যমান্য!—কথাটা ভাবলে আমার হাত কামড়াতে ইচ্ছে করে।'

একটু চুপ ক'রে থেকে মা বললেন, 'তোর যা ভালো লাগে না তা তুই করিস কেন, মৌলি। চাকরি ছেড়ে দে; চল কলকাতায়।'

মৌলি একটু হেসে বললে, 'তুমিই আমার বন্ধন, মা। তুমি না-থাকলে এতদিনে এ-দেশেই থাকতাম না আমি।'

'তুই যদি বিলেত যেতে চাস আমি নিশ্চয়ই বাধা দেবো না। এখানে ইউনিভর্সিটি থেকেই তো প্রোফেসরদের বিলেতে পাঠাবার ব্যবস্থা আছে।'

মৌলি হেসে উঠলো।—'মা, তুমি বলছো কী। কৃশ দাক্ষিণ্যের কৃপণ অন্নে প্রতিপালিত হ'য়ে লণ্ডন শহরে চোখ-কান বুজে দু-বছর কাটিয়ে কষ্টে-সৃষ্টে কোনোরকমে একটা ডিগ্রির রবার-স্ট্যাম্প নিয়ে দেশে ফিরেই একশো মুদ্রা বেশি মাইনেওলা কোনো চাকরির চেষ্টায় মুখে রক্ত তোলা—এ তুমি আমার জন্য কী ক'রে ভাবতে পারলে! বিলেতের বুড়ি ছুঁয়ে এসে সাংসারিক উন্নতি করা তো আমার উদ্দেশ্য নয়— আমি যদি যাই, শিগগির হয়তো আর ফিরবোই না। স্পেনের রোদ্দুর, ইটালির সমুদ্র, জর্মনির নগর, রাশিয়ার তুষার, সব আমাকে দেখতে হবে, মা— আর সে-দেখা তো শুধু চোখের দেখা নয়, তাতে অনেক সময় লাগে, অনেক সাধ্য-সাধনা করতে হয়।'

মা বললেন, 'আজ তোর টাকার অভাব, কিন্তু একদিন তোর ইচ্ছে পূর্ণ হবে নিশ্চয়ই।'

বাইরের দিকে তাকিয়ে মৌলি বললে, 'না, মা, এই বাংলা দেশই সবচেয়ে ভালো আমার—এমন বর্ষা তো আর-কোনো দেশেই নেই।'

স্তব্ধতার বুক ফেটে বেরিয়ে এলো ঠাণ্ডা উদ্দাম হাওয়া, গাছে-গাছে চকিত কাকের তীক্ষ্ণ কা-কা শব্দে আকাশ ভ'রে গেলো, বটগাছের বিরাট জটিল দেহটি অশরীর মতো নৃত্যশীল হ'য়ে উঠলো। মৌলি নিশ্বাস ফেলে বললে, 'কোন প্রাণে এই বটগাছ ওরা কেটে ফেলবে, মা!'

কথার জবাব দেবার সময় পেলেন না মা, দমকা হাওয়ায় টেবিলের কাগজপত্র নিয়ে তাণ্ডব বাধালো। উড়ুক্কু কাগজকে ঠিক সময়ে ধ'রে ফেলে জানলা বন্ধ করতে যাচ্ছিলেন তিনি, মৌলি হাত তুলে বাধা দিলো। 'খোলা থাক, মা। দেখি।'

'ধুলো আসছে যে।'

'ধুলো আর কতক্ষণ। বৃষ্টি এলো ব'লে—ঐ এসেই গেছে।'

মা জানলা থেকে স'রে এসে টেবিলের কাগজপত্র চাপা দিয়ে-দিয়ে রাখতে লাগলেন। ভীষণ শব্দে বাজ ডেকে উঠলো, তারপর ঝমঝম ক'রে যেই বৃষ্টি নামলো অমনি দ্রুত নিঃশব্দ পায়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলো একটি মেয়ে।

—'উঃ, খুব বেঁচে গেছি।'

তার কথা শুনে মা মেয়ে দু-জনেই চমকে তাকালো। 'গীতা!' ব'লে মা দেয়ালে হাত রেখে আলো জ্বাললেন। বাইরে মেঘের অন্ধকার, তাই ঘরের মধ্যে ইলেকট্রিক আলো খুব বেশি উজ্জ্বল ঠেকলো, কেমন কড়া রকমের হলদে। সে-আলোয় মেয়েটিকে ভালোই দেখালো; তার চুলে, মুখে চিকচিক করছে জল, শাড়িতে বৃষ্টির ফোঁটার কয়েকটা কালো-কালো দাগ। মা এগিয়ে এসে বললেন, 'ভিজিসনি তো?'

'না, মাসিমা, আমিও ঢুকছি আর বৃষ্টি নামলো।' গীতা বাঁ হাত দিয়ে কপালের জল মুছে ফেলে হাসলো। 'মেয়েদের হস্টেলে একটা পার্টি

ছিলো আজ, সেখান থেকে বেরিয়ে ভাবলাম, একবার—' কথাটা সে শেষ করলো না।

'বেশ করেছিস। বোস।'

গীতা বললে, 'মাসিমা, আপনার জন্যেই আমি এ-বাড়িতে আসি। মৌলি-দা আমাকে তো চিনতেই পারেন না।'

'ও তো ঐ-রকমই—ওর কথা তুই আবার ধবিস।'

মৌলি বললে, 'তোমাকে দেখে আমি অবাক হ'য়ে গিয়েছি, গীতা, তাই কিছু বলিনি।'

'কেন? অবাক হবার কী আছে?'

'ঠিক বৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গেই তো ঢুকলে তুমি—আমার মনে হ'লো যেন আকাশ থেকেই পড়লে।'

'আমার কথা তো কখনোই মনে পড়ে না তোমার; তাই যখনই ছাখো, তখনই অবাক হও।'

'ওর মন কি এ-জগতে থাকে যে কারো কথা ওর মনে পড়বে! তুই বোস গীতা—আমি একটু কাজ সেরে আসি,' ব'লে মা ঘর থেকে চ'লে গেলেন। গীতা টেবিলের ধারে চেয়ারটিতে ব'সে বললে, 'ঈশ, কী বৃষ্টি! কিছু দেখা যায় না।'

মৌলি বললে, 'বৃষ্টি পড়লেই আমার কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে।'

'লিখবে? আমি চ'লে যাবো ঘর থেকে?'

'না, না, বোসো। ইচ্ছে হ'লেই যদি কবিতাও হ'তো তাহ'লে আর জীবনে দুঃখ ছিলো কী।'

টেবিলের উপর একটা কাচের কাগজ-চাপা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে-করতে গীতা বললে, 'সেদিন ক্লাশে তুমি ব্রাউনিং-এর কবিতা নিয়ে যে-সব কথা বলছিলে, ভালো বুঝতে পারিনি।'

'আমি পারি না বুঝিয়ে বলতে। আর বোঝাবোই বা কী? নিজেই কি মনস্থির করতে পেরেছি? এক-এক সময় এক-এক রকম মনে হয়।'

'আমার খুব ইচ্ছে করে মাঝে-মাঝে তোমার কাছে এসে প'ড়ে যাই। কিন্তু তোমার তো সময় হয় না।'

'বেশ তো—এসো না মাঝে-মাঝে।'

'ক্লাশের মেয়েরা আমাকে বলে—তোর আর ভাবনা কী। স্বয়ং মৌলিনাথবাবু তোর সহায়! আমি মুখে কিছু বলি না, কিন্তু মনে-মনে তো জানি যে তোমাকে সহায়রূপে পাবার মতো পুণ্যবল আমার নেই।'

মৌলি হেসে ফেলে বললে, 'বেশ কথা বলতে শিখেছো তো। ঐটুকু গীতা আজ এত বড়ো হয়েছে—এত কথা বলে, অ্যাঁ!'

'তুমি আমাকে ছোটো দেখেছো সে তো আমার অপরাধ নয়—তার জন্ম আমাকে কেন শাস্তি দাও?'

'এ আবার কী-রকম কথা, গীতা?'

গীতা মাথা নিচু ক'রে চুপ ক'রে রইলো।

'কী যেন, তোমার অভিমানের মানে বুঝি না আমি। বললাম তো—যখন সুবিধে হয় পড়তে এসো। কিন্তু পাশ করানোর মতো ক'রে পড়াতে আমি পারি না, তা তো জানো?'

'হ্যাঁ—আমি তো পাশ করবার জন্যই জীবন পণ করেছি!'

'না, না, জীবন পণ তোমাকে কেন করতে হবে—তুমি তো নেহাৎ সাধারণ মেয়ে নও। প্রোফেসরদের সকলেরই ধারণা যে সামনের বার একটিই ফর্স্ট ক্লাস হবে—সে তুমি।'

'তোমার কথা যখন ভাবি, তখন আমার কিছুই ভালো লাগে না।'

'কেন বলো তো?'

'তোমার মতো হ'তে না-পারলে কিছু না-হওয়াই ভালো। ছাত্র-ছাত্রীরা

কথায়-কথায় বলে—সবাই কি আর মৌলিনাথ হয়! তোমাকে প্রতিযোগিতার বাইরেই রেখেছে ওরা। কিন্তু আমি তা পারি না। আমার মনে হয় যে তুমি যেখানে আছো সেখানে কোনোদিনই পৌঁছতে পারবো না, এইটেই যদি স্বতঃসিদ্ধ, তাহ'লে এ-সব চেষ্টার প্রহসন ক'রে কী লাভ। দেশ ভ'রে কত ছেলেমেয়েই তো প্রত্যেক বছর পরীক্ষায় ফার্স্ট হচ্ছে, মাত্র তাদেরই একজন হওয়াতে গৌরব কিসের। সাধারণের মধ্যে একটু ভালো না-হ'য়ে সাধারণের মধ্যে সাধারণ হওয়াই বোধহয় ভালো।'

মৌলি হাঁটু চাপড়ে ব'লে উঠলো, 'গীতা! এইটে আমার মনের মতো কথা বলেছো!'

'এম. এ. পড়তে আমি আসতামই না, কিন্তু বাবা জোর করলেন। দিদি পরীক্ষার দু-মাস আগে ছেড়ে দিয়েছিলেন, তাই নিয়ে বাবার মনে ক্ষোভ আছে। কেন যে দিদি ও-রকম করেছিলেন, আমার এখনো একটু অবাক লাগে ভাবতে। বিয়ে করলে পরীক্ষা দিতে দোষ কী?'

মৌলি চুপ ক'রে রইলো।

'সেদিন দিদি অনেক উৎসাহ ও উপদেশ দিয়ে চিঠি লিখেছেন আমাকে, তোমার কথাও লিখেছেন তাতে।'

আধ-বুড়ো রাখু ঘরে ঢুকে মৌলির সামনে চায়ের ট্রে নামিয়ে রেখে চ'লে গেলো। সবুজ আর হলুদে ডোরা-কাটা কাপড়ে ট্রে-টি ঢাকা, চায়ের বাসনগুলি গোয়ালিয়রের উজ্জ্বল-নীল।

গীতা ব'লে উঠলো, 'আমি কিন্তু না! এইমাত্র খেয়ে আসছি।'

'একটা মিষ্টি নিমকিও খাবে না?'

'আচ্ছা, দাও।' মৌলি প্লেট সুদ্ধু তুলে ধরলো, কিন্তু গীতা বললে, 'না, আধখানা।' মৌলির হাত থেকে আধখানা মিষ্টি নিমকি নিয়ে সে

দু-আঙুলে ধ'রেই রইলো। মৌলি একটি প্লেট দিতে যাচ্ছিলো, গীতা মাথা নাড়লো।—'ও লাগবে না। একটু চা-ও দাও—আধ পেয়ালারও কম কিন্তু।'

মৌলি গীতাকে অল্প একটু চা ঢেলে দিয়ে তারপর নিজের জন্য ঢাললো। বাইরে কালো অন্ধকার বৃষ্টির তরঙ্গে আত্মহারা। থেকে-থেকে মেঘের ডাক গুরুগুরু শব্দে মিলিয়ে যাচ্ছে এই আকাশ পার হ'য়ে অন্য কোনো আকাশে। হাওয়ার উচ্ছ্বাস ছাপিয়ে কানে আসছে বটগাছটার বিশাল ব্যাকুল দীর্ঘশ্বাস—সে যেন শিকড় ছিঁড়ে পাখা মেলে আকাশে উড়ে যাবে, এমনি তার পাখাঝাপটানি।

গীতা হঠাৎ বললে, 'এ-ঘরে ব'সে চা খেলেই আমার একদিনের কথা মনে পড়ে।'

মৌলি চোখ তুলে তাকালো। ঠিক যে চোখ দিয়ে প্রশ্ন করলো তা নয়, ঠিক যে গীতারই দিকে তাকালো তাও নয়। যেমন আমরা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে মনে-মনে কিছু ভাবি, তেমনি গীতার দিকে তাকিয়েও সে যেন তাকে দেখছে না। গীতা মাথা নিচু ক'রে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলো, তারপর মুখ তুলে বললো, 'অনেকদিন আগেকার এক সকালবেলার কথা মনে পড়ে আমার। হঠাৎ এ-ঘরে এসেছিলাম—ছোড়-দাও ছিলো সঙ্গে—তুমি আর দিদি ব'সে গল্প করছিলে আর চা খাচ্ছিলে। সব সুদ্ধু বোধহয় দু-মিনিটও ছিলাম না ঘরে, কিন্তু ওরই মধ্যে একটা তীব্র ভালো লাগায় আমি আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছিলাম। সেই সুখের শিহরণ এখনো মিলিয়ে যায়নি আমার মন থেকে। এখনো মনে করতে পারি সেই গন্ধ—সে কি চায়ের, না চাঁপাফুলের, না সেই উজ্জ্বল গ্রীষ্মের তা বলতে পারবো না, কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত ভালো, সমস্ত সুন্দর আমার মনে আজ পর্যন্ত সেই গন্ধের সঙ্গে জড়ানো।' গীতা আবার

চায়ের পেয়ালার উপর মুখ নিচু ক'রে চোখ বুজে একবার গভীর নিশ্বাস নিলো।—'এই চায়ের গন্ধে সেই সকালবেলাটা মনের মধ্যে ফিরে আসে। তোমার মনে পড়ে?'

মৌলি চুপ ক'রে রইলো। গীতা মুখ তুলে বললো, 'সেদিন তুমি আমাকে একটি চাঁপাফুল দিয়েছিলে—মনে পড়ে তোমার?'

মৌলি হেসে বললো, 'তা পড়ে না! যা সুন্দর তুমি ছিলে তখন।'

'তা তোমার মতো বয়স বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে আরো বেশি সুন্দর হ'তে পারে না তো সকলে।'

'আমি দেখতে ভালো, এ-কথা তোমার মুখেই প্রথম শুনলাম।'

গীতা আবেগের সঙ্গে বললে, 'এ-কথা যে না বলে তার চোখ নেই। দিদির মুখে হাজার বার অন্তত এ-কথা শুনেছি যে মৌলির মতো চোখ, মৌলির মতো হাসি কোনো মানুষের হয় না।'

'দিদির তুমি অত্যন্ত বেশি ভক্ত ছিলে, গীতা—সেই ছেলেবেলার ছাপটা মন থেকে মুছে ফেলতে পারছো না।'

'দিদির সঙ্গে সেই শেষ বোধহয় আমার এ-বাড়িতে আসা। তার কয়েকদিন পরেই ওঁর বিয়ে হ'লো, মাসখানেকের মধ্যে মহেন্দ্রবাবু দিল্লিতে চাকরি নিয়ে চ'লে গেলেন। তারপর ওঁরা যতবার ছুটির সময়ে এসেছেন, একবারও তুমি এখানে ছিলে না। মৌলি-দা, তারপরে কি দিদির সঙ্গে একবারও তোমার দেখা হয়নি?'

কথাটা জিগেস ক'রে গীতা ঈষৎ ভীত চোখে মৌলির দিকে তাকালো। মৌলি হেসে বললে, 'বাঃ, হয়েছে বইকি। তুমি যা-ই বলো, গীতা, দিল্লির জল-হাওয়ার নিন্দে আমি করতে পারবো না—মানুষের স্বাস্থ্য ভালো হয় ওখানে।'

'মৌলি-দা, একটা কথা বলবো, রাগ করবে না?'

'বলো।'

'আমাকে যতটা ছেলেমানুষ তুমি ভাবতে ততটা ছেলেমানুষ আমি ছিলাম না তখন। সবই বুঝতাম, আর তোমাদের দেখে-দেখে নিজের মনে রোমাঞ্চিত হতাম।'

মৌলি গম্ভীরভাবে বললে, 'সেটা খুব স্বাভাবিক।'

'খুব খারাপ লেগেছিলো তোমার?'

মুহূর্তের জন্য মৌলির মুখ কোমল দেখালো। আবছা একটু হেসে বললে, 'জানো তোমার দিদি আমাকে ছেলেমানুষ বলেছিলেন। সেইটাই সবচেয়ে খারাপ লেগেছিলো।'

গীতা কথা বললো না। মাথা নিচু ক'রে সিঁথির প্রান্তদেশে আস্তে দুটি আঙুল বুলোতে লাগলো। বৃষ্টির কাছে হার মেনেছে হাওয়া; বাইরে এখন আর-কোনো শব্দ নেই, মনে হয় যেন আর-কোনো বস্তুও নেই; পৃথিবী ভ'রে শুধু বৃষ্টিরই রাজত্ব, তারই সুর, তারই ভাষা, তারই আবেশ।

গীতার দিকে তাকিয়ে থেকে-থেকে মৌলি হঠাৎ ব'লে উঠলো, 'তোমার শাড়ির রংটি বেশ।'

গীতা নিচু চোখেই বললে, 'হেলিওট্রোপ রং খুব ভালো লাগে আমার।'

'ও—এরই নাম বুঝি হেলিওট্রোপ?' মৌলি আর-একরবার তাকালো।

সিঁথির উপর মৃদু-গতিশীল আঙুল দুটি স্তব্ধ হ'লো; হাতটি নেমে এলো কোলের উপর, মাথা উঁচু হ'লো; আলোর তলায় চোখ দু-টি চিকচিক ক'রে উঠলো।—'না, মৌলি-দা, রংটা বাজে। যে-রং আমাকে ছাড়িয়ে ওঠে তার চেয়ে বাজে নাকি আর-কিছু!'

'আমি এ-কথাই বলতে যাচ্ছিলাম যে রংটিতে তোমাকে বেশ মানিয়েছে।'

'তাতেই বা কী। আর কি মেয়ে নেই যাকে এ-রং মানায়? ভুল বলেছি, মৌলি-দা—রংটা বাজে নয়, বাজে আমি। আমি শাড়ি পরলে

আমাকে ছাপিয়ে সে চোখে পড়ে। আমি বই পড়লে সে একটা আলাদা নড়বড়ে জিনিশ হ'য়ে মনের সঙ্গে লেগে থাকে। অন্ত লোক ভুলতে পারে না শাড়ি পরেছি, বই পড়েছি।'

'গীতা, নিজের উপর অবিচার করছো তুমি। আজ নিশ্চয়ই তোমার কিছু হয়েছে—কোনো কারণে মন ভালো নেই।'

'আমি অনেক সময় ভাবি, আমার মধ্যে এমন-কিছু কি নেই, যার কোনো বিশেষণ, কোনো আভরণ দরকার হয় না—যা নিছক আছে ব'লেই মূল্যবান?'

মৌলি ঈষৎ হেসে বললে, 'এত দুঃখ কিসের, গীতা। কিছুরই কোনো মূল্য হয় না, যতক্ষণ না কেউ এসে মূল্য দেয়। তোমাব পূর্ণ মূল্য যে দেবে সেও একদিন আসবে।'

নিমেষে পাংশু হ'য়ে গেলো গীতার মুখ, ভরা-ভরা ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠলো। নিশ্বাস টেনে বললে, 'এত নিষ্ঠুর তুমি! এ নিয়ে আমাকে ঠাট্টা করতে পারো!'

'তা মাঝে-মাঝে এক-আধটু ঠাট্টা—' কিন্তু গীতার মুখের দিকে তাকিয়ে মৌলির কথা বন্ধ হ'য়ে গেলো। গীতা রুদ্ধস্বরে বলতে লাগলো, 'তুমি নিষ্ঠুর, তুমি হৃদয়হীন—নিজেকে ছাড়া কাউকেই তুমি ভালোবাসো না—'

চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো মৌলি। গীতার পাশে দাঁড়িয়ে বললে, 'গীতা, হয়েছে কী বলো তো?'

গীতার দুই চোখ আগুনেব মতো জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো, জোরে নিশ্বাস নিতে-নিতে বললে, 'কী হয়েছে জানো না তুমি? কী ক'রেই বা জানবে—অন্ত-কোনো মানুষ তো চোখেই পড়ে না তোমার, নিজেকে নিয়েই মত্ত আছো সব সময়। তুমি দাম্ভিক, তুমি স্বার্থপর, তুমি অন্ধ! ছেলেবেলা থেকে কাকে আমি দেবতার মতো পুজো করেছি তা কি তুমি জানো? কার কাছে এসে একবার একটু দাঁড়াতে পারলে সমস্ত দিনটা সার্থক মনে হয়েছে,

তা কি জানো তুমি? আর আজ—আজ দেখছি—দেখছি যে—'

গীতা আর বলতে পারলো না, তার গলা ভেঙে গেলো, টেবিলের উপর দু-হাত ছড়িয়ে সে মুখ ঢেকে ফেললো হাতের মধ্যে। মৌলি তার মাথার উপর হাত রেখে সস্নেহে ডাকলো, 'গীতা!' সঙ্গে-সঙ্গে তার বাঁকানো পিঠটি কেঁপে উঠলো; ছোটো-ছোটো ভাষাহীন শব্দ বেরোতে লাগলো মুখ দিয়ে। মৌলি হ'য়ে তার মাথার উপর ঝুঁকে প'ড়ে বলতে লাগলো, 'গীতা, শোনো—ছী-ছী-ছি, এ-রকম করে না—কী হয়েছে বলো তো—মুখ তোলো, গীতা, তাকাও—লক্ষ্মী মেয়ে, কথা শোনো আমার—'

গীতা এক ঝটকায় চেয়ার ঠেলে উঠলো, আঁচলে মুখ ঢেকে ছুটে বেরিয়ে গেলো পাশের ঘরে। তার পরিত্যক্ত চেয়ারটিতে ব'সে প'ড়ে মৌলি মন দিয়ে শুনতে লাগলো বর্ষার ঝঙ্কার সুর। সে-সুর উদ্দাম নয় আর, নয় বন্ধহীন, বিশ্বজয়ী; এখন তা বিষণ্ণ, নিবিষ্ট, তন্দ্রা-ভরা। বৃষ্টির বেগ ক'মে আসবার সঙ্গে-সঙ্গে আবার যে-হাওয়াটি বইছে, তাতেও আর স্পর্ধা নেই, মত্ততা নেই, তা এখন শান্ত, সজল, এলোমেলো। মৌলি ভেবে পেলো না বৃষ্টির কোন রূপটি বেশি সুন্দর—যখন সে হৈ-চৈ ক'রে আসে, না যখন সে ঝোঁকে-ঝোঁকে কেঁদে-কেঁদে বিদায় নেয়।

মৌলির মা দ্রুত পায়ে ঘরে এসে ছেলের সামনে দাঁড়ালেন। একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'মৌলি। গীতার কী হয়েছে? কাঁদছে কেন?'

মৌলি কিছু বললো না।

'তোকে একটা কথা বলি, মৌলি। গীতাকে তোর বিয়ে না-করবার কী যে কারণ থাকতে পারে আমি তো ভেবে পাই না।'

'মা!' মৌলি তার বড়ো-বড়ো চোখ মা-র মুখের উপর ফেললো। 'মা, তুমি কি পাগল হ'লে?'

'কেন, এতে পাগল হবার কী আছে। ওর মা-বাবার তা-ই ইচ্ছে।

আর ওর নিজের কথা আর কী বলবো।'

মৌলি তার ঘন চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিয়ে বললো, 'আমিও ভাবছিলাম, আমার সান্নিধ্য থেকে ওকে সরানো দরকার—নয়তো জীবনে ও সুখী হ'তে পারবে না।'

'তোকে নিয়েই ওর সুখ, মৌলি। কিন্তু বিয়ে করতে তোর আপত্তিটা কী, শুনি?'

'কী যে তোমরা বলো, মা! ঐটুকু মেয়ে—'

'একুশ বছরের মেয়ে ঐটুকু হ'লো! বয়সের দিক থেকে ওকে ঠিক মানায় তোর সঙ্গে—অন্য কোনো বিষয়েই ও তোর অযোগ্য নয়। তাছাড়া সবচেয়ে বড়ো কথা হ'লো যে ও তোকে ভালোবাসে!'

'আমিও ওকে ভালোবাসি, মা, কিন্তু ভালোবাসা মানেই তো আর বিয়ে নয়।'

'তোর মুখে তত্ত্বকথা শুনতে চাই না আমি। তুই আমাকে স্পষ্ট ক'রে বল—'

'মা!' মৌলি বাধা দিয়ে ব'লে উঠলো। 'কী যে তুমি বলো তার কোনো মানে হয় না। এইটুকু বয়স থেকে দেখে আসছি ওকে—ছেলে-মানুষ ছাড়া কিছু ভাবতে পারি না—ওকে ঠিক আমার ছোটো বোনের মতো লাগে। বিয়ে? ছী-ছি, এ-কথা তুমি ভাবতে পারলে কেমন ক'রে?'

মা রাগ ক'রে বললেন, 'বিয়ে যে করবি না তা তো নয়?'

'আমি কি সে-কথা বলেছি?'

'হয়তো ওর বয়সের মেয়েকেই করবি?'

'ওর বয়সের সব মেয়েকেই আমার ছেলেমানুষ লাগে, তা তো বলিনি।'

'কিন্তু সব মেয়েই কি ওর মতো যোগ্য?'

'তোমার এ-সব কথা আমার ভালোই লাগে না, মা। যোগ্য-অযোগ্যের

কথা ওঠে কিসে? বিয়েটা কি ব্যবসা, না চাকরি?'

'তাহ'লে—ওকে ছেলেবেলা থেকে চিনিস, শুধু এই অপরাধে ওকে ত্যাগ করবি?'

'ও-রকম ক'রে বোলো না, মা—আমার কষ্ট লাগে। আমিও মানুষ, আমারও একটা হৃদয় আছে।'

মা শেষ চেষ্টা করলেন, 'এর ফলে ওর জীবন যদি ব্যর্থ হয়?'

মৌলি গভীর স্বরে বললে, 'আমি—আমি না-হয় ঢাকা ছেড়েই চ'লে যাই, মা।'

মা স্তব্ধ হ'য়ে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কয়েক মুহূর্ত কাটলো চুপচাপ, তারপর মৌলি ন'ড়ে-চ'ড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'ওকে তুমি একটু শান্ত করো, মা, তারপর রাখুকে পাঠিয়ে দাও গাড়ি আনতে। বৃষ্টিটা ধ'রে আসছে—এই ফাঁকে ওকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে আসুক।'

মা বিবর্ণ মুখে চ'লে গেলেন ঘর থেকে। মৌলি এসে জানলার ধারে দাঁড়ালো। আকাশে মেঘ পাৎলা হয়েছে, একটি দু-টি তারা জ্বলজ্বল করছে স্বর্গের বৃষ্টি-বিন্দুর মতো। আবছা আলোয় বটগাছটার বিরাট অস্পষ্ট মূর্তি চোখে এসে লাগলো। তার লক্ষ পাতা থেকে লক্ষ-লক্ষ জলের ফোঁটা টপ-টপ ক'রে ঝ'রে পড়ছে—সারা রাত ধ'রে ঝরবে—কানে না-শুনেও মৌলি সে-শব্দ মনে-মনে শুনলো। এই গাছ ওরা কেটে ফেলবে, বোবা হ'য়ে যাবে মাঠ, বিধবা হবে বৃষ্টি, বর্ষার তানপুরোর তার যাবে ছিঁড়ে। 'আমি—আমিও আর এখানে থাকবো না,' মৌলি মনে-মনে বললো, 'আমিও চ'লে যাবো।'

১৯৪৫

একটি কি দুটি পাখি

একটা বাঙলো, অতিথিরা বিদায় নিতে লাগলেন। আলো জ্ব'লে উঠলো গাড়ি-বারান্দায়, একে-একে এসে দাঁড়ালো ছোটো-বড়ো গাড়ি, তার প্রত্যেকটিতেই জায়গা হ'লো একজন বা দু-জন অতিথিরের, কেননা বাংলাদেশ এমনই দেশ যে অনিরুদ্ধ চ্যাটার্জির বন্ধুবান্ধবও সকলেই গাড়িওলা হ'তে পারেন না। যাঁদের গাড়ি নেই তাঁদের তাড়া বেশি, তাই সর্বশেষে কেশব বাগচির সর্বাধুনিক ধনীজনোচিত ফোর্ড যখন বিরাটভাবে নিজেকে জাহির করলো, তখন অতিরিক্ত কেউ আর প্রায় রইলোই না। বাগচি একটু নিরাশ হলেন, কেননা তাঁর গাড়িতে খুব বেশি ঘেঁষাঘেঁষি না-ক'রে সাত-আটজন বসতে পারে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে হাঁক দিলেন, 'কই, আর-কেউ আছে নাকি?'

'এই যে, একে নিয়ে যান,' চ্যাটার্জি ফুটফুটে চেহারার গোলগাল একটি যুবককে এগিয়ে দিলেন, রমেশ বিশ্বাস, তাঁর অপিশের টাটকা বিলেত-ফেরৎ অ্যাপ্রেনটিস।

'আসুন, আসুন,' বাগচির কণ্ঠস্বরে এমন অভ্যর্থনা উচ্ছ্রিত হ'লো যে নবোদ্গত রমেশ লজ্জায় জড়োসড়ো হ'য়ে মিশে গেলো গাড়ির গদিতে। —'আর-কেউ? আর-কেউ যাবেন?—আপনি, তপনবাবু?'

সিঁড়ির দ্বিতীয় ধাপে গৃহকর্তার পাশে দাঁড়ানো ভদ্রলোকটি অত্যন্ত মৃদুস্বরে জবাব দিলেন, 'আমি একটু '

'আসুন না,' বাগচির আপ্যায়ন উচ্চল হ'লো। 'গাড়িতে ঢের জায়গা আছে।'

তপন সরকার অত্যন্ত নম্র হেসে বললেন, 'আমি রোগা মানুষ, অত বড়ো গাড়ির কতটুকু জায়গা আর ভরাবো।'

ব্যর্থ হ'লো ঠাট্টা, বাগচি আর-এক পরদা গলা চড়িয়ে আবার বললেন, 'আসুন না, বেশ গল্প করতে-করতে যাওয়া যাবে।'

অগত্যা চ্যাটার্জিকেই বলতে হ'লো, 'কিছু মনে করবেন না, মিস্টর বাগচি, সরকারকে আমিই ধ'রে রাখছি। রাত্তিরটা এখানেই থাকবেন উনি।'

'ও! তা বেশ!' ব'লেই বাগচির ঠোঁট দুটি যেন চেপে বন্ধ হ'য়ে গেলো, গম্ভীরমুখে গাড়ির দিকে অগ্রসর হলেন তিনি।

চ্যাটার্জি বললেন, 'অনেক ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ আপনাকেই—খুব আনন্দ হ'লো,' ঈষৎ নিরানন্দ স্বরে শেষ কথাটি ব'লে বাগচি গাড়িতে উঠে চলচ্চক্রে হাত রাখলেন।

'আচ্ছা, নমস্কার।'

সিঁড়ির শেষ দুটি ধাপ আস্তে-আস্তে উঠে দু-বন্ধু বারান্দা পার হলেন। খানিকটা গলি চ'লে গেছে বড়ো ড্রয়িংরুমের দিকে, কয়েক পা এগিয়ে চ্যাটার্জি ডান দিকের দরজার হাতল ঘোরালেন।

—'আসুন, এখানেই বসি।'

ঘরটি চ্যাটার্জির লাইব্রেরি। মাঠের মতো চওড়া টেবিল, ব্রাউন রঙের চামড়ায় মোড়া মস্ত-মস্ত চেয়ার, অনচ্ছ কাচের আধারে বৈদ্যুৎ-বাতি প্রশমিত, যেন আলো নয়, আভা। সমস্ত ঘরটিতে প্রশান্তির, প্রাচীনতার, লুপ্ত স্মরণীয় স্মৃতির আবছা ঝাপসা গন্ধ। চ্যাটার্জির লাইব্রেরি স্থাপত্য আর চিত্রকলা বিষয়ে কলকাতায় শ্রেষ্ঠ, ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ স্থপতি তিনি, গ্রীক-রোমক জীবনদর্শনের উপাসক। টানা পাঁচ ঘণ্টার মুখর সমারোহের পরে দু-বন্ধু দুটি চেয়ারে ব'সে খানিকক্ষণ নিঃশব্দে অনুভব করলেন এই শান্তির সুষমা।

মৃদু আলোয় ছায়ামূর্তির মতো একটি বেয়ারা এসে দাঁড়ালো।

'আন্টিগুয়া না নীলগিরি?'

সরকার বললেন, 'আপনি তো জানেন পানাহারে আমি পারদর্শী নই,

আপনার অনুগামী হ'তেই ভালোবাসি।'

চ্যাটার্জি অস্ফুটে আদেশ উচ্চারণ করলেন।

কফি এলো, সঙ্গে চ্যাপ্টা বোতলে কন্যাক। দুটি পেয়ালায় গুয়েটেমালার সৌরভের সঙ্গে ফ্রান্সের আগুন-বরন দ্রাক্ষারস মিশিয়ে চ্যাটার্জি চেয়ারে একটু গা এলিয়ে দিলেন। টেবল-ল্যাম্পের আলো তাঁর মুখের উপর প'ড়ে প্রৌঢ়তার সৌন্দর্যকে উন্মোচিত ক'রে দিলো। পিছন দিকে ফেরানো শাদা-কালো সুপ্রচুর চুল, কপালে আবিষ্টতার রেখা, ভাসা-ভাসা উজ্জ্বল স্বপ্নিল সুন্দর দুটি চোখ। যে-যৌবন তাঁর চ'লে গেছে চিরকালের মতো তারই একটি-দুটি পাখি এখনো যেন লুকিয়ে আছে তাঁর চোখের নীড়ে।

সে-মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে সরকার বললেন, 'আচ্ছা, মিস্টর চ্যাটার্জি, এ-সব সত্যি ভালো লাগে আপনার?'

'কী-সব?'

'এই পার্টি, ডিনার, লোকজনের কোলাহল?'

'ভালো যা না লাগে, তা আমি করি না।'

'আমার কিন্তু মনে হয় এ থেকে আপনি কোনো আনন্দ পান না—এটা আপনার ব্যসন?'

'ব্যসন মানে?'

'ব্যসন মানে—আপনি অবিবাহিত, আপনার সংসার নেই, ছেলেপুলে নেই, এ-বয়সের মানুষের জীবনে যে-সব দায়িত্ব জ'মে ওঠে, তার কিছুই নেই আপনার, আর সেই ফাঁকটা আপনি ভ'রে তুলতে চান সামাজিকতায়—সকলেই বলে আপনার বাড়ির নিমন্ত্রণগুলোই কলকাতায় সবচেয়ে জমকালো। কিন্তু ক্লান্ত লাগে না আপনার? মনে হয় না সময় নষ্ট হচ্ছে?'

'আপনার খুব খারাপ লাগে বুঝতে পারি।'

'আপনার কথা ভেবেই খারাপ লাগে আমার। যারা আসে তারা আপনাকে চায় না, আপনার বাড়িতে যে-সব সুখের সুযোগ আছে সেইগুলির দিকে তাদের লোভ।'

'তা-ই তো, তা-ই তো হবে। বিশেষভাবে আমাকেই চাইতে পারে, এমন কী যোগ্যতা আমার। কিংবা—' একটু হাসি খেলা করলো চ্যাটার্জির ঠোঁটে—'তাদেরই বা এমন কী যোগ্যতা। অর্থাৎ এই নিস্পৃহতাটা রীতিমতো পারস্পরিক। আমিও তো চাই না তাদের—তারা আসে, ছোটো-ছোটো দলে বিভক্ত হ'য়ে গল্পগুজব করে—প্রকাশ করে তাদের চপলতা, শঠতা, মূঢ়তা—আমি ব'সে-ব'সে দেখি।'

'কিন্তু এমন-কিছু কি গ্যাখেন, যা আপনি জানেন না, ভাবতে পারেন না?'

'আমি ভাবতে পারি না এমন কিছু-কিছু চোখে পড়ে বইকি। পড়ে ব'লেই বুঝতে পারি যে যদিও একালেই বেঁচে আছি, আমি আর একালের নই। একটা জিনিশ লক্ষ্য করেছেন, মিস্টর সরকার? মেয়েদের শাড়ি পরবার ফ্যাশন আজকাল এমন হয়েছে যে বুকের ডান দিকটা আঁচলে ঢাকাই থাকে না, জামার ভিতর দিয়ে পরিষ্কার চোখে পড়ে?'

নৈশ ভোজে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে দু-তিনজনকে স্মরণ ক'রে সরকারকে স্বীকার করতে হ'লো যে কথাটা অক্ষরে-অক্ষরে সত্য।

'এরই নাম কালস্রোত। ভালো লাগুক আর না লাগুক, এর সঙ্গে চেতন মনের সংযোগ রাখাটা স্বাস্থ্যকর। সেইজন্যই—,' চ্যাটার্জি নিচু হ'য়ে কফিতে চুমুক দিলেন। 'কিন্তু চেতন মন আমাদের কতটুকুই বা। সে আমাদের পাহারাওলা মাত্র—কিংবা গুরুমশাই—সব সময় সে এই ব'লে শাসাচ্ছে, "এটা এ-যুগের, এটা আধুনিক, এটাকে গ্রহণ করতে না যদি পারো তবে তোমার বেঁচে থাকাই মিথ্যে!"—আর তার ধমক খেয়ে প্রাণপণে আমরা চেষ্টা করছি যুগ-পা-যোগী হ'তে, যুগের তালে-

তালে পা মিলিয়ে চলতে। কিন্তু আমাদের অচেতন মনের অন্তঃপুরে ব'সে আছে তো সেই অতীত, যে-অতীতে আমরা নিজেরা তরুণ ছিলাম। এইরকম কোনো রাত্রে, যখন একান্তরূপে বর্তমানের ভিড় কাটিয়ে নিজের ঘরে একলা এসে বসি, তখন মনে পড়ে সেই জগৎকে, যে-জগৎ আমার ছিলো আর যার মধ্যে আমি ছিলাম। কোথায় সে? অসীম তার দূরত্ব, রূপও তার অতুলনীয়। সে যেন পুরাকালের গ্রীস বা রেনেসাঁসের ইটালি—এই শুধু প্রভেদ যে ও-সব ঐতিহাসিক যুগ—পৃথিবীর কৈশোর আর যৌবন-বেঁচে আছে বিশ্বজীবনের হৃৎস্পন্দনে, আর আমার যৌবনকাল আর-কোনোখানেই নেই, আমার মনে ছাড়া, আমার অচেতন অচিত্রিত মনে।—কোথায় সব, কোথায় আমার যৌবনের পাখিরা, আমিই বা কোথায় চ'লে এসেছি।' আর একবার কফিতে ঠোঁট ভিজিয়ে চ্যাটার্জি আস্তে-আস্তে একটি নধর পরিপুষ্ট হাভানা-সিগার ধরালেন, শাদা, ছাইরঙা, বাঁকা-বাঁকা ধোঁয়ায় মুহূর্তের জন্য তাঁর মুখ আবছা হ'লো।

হঠাৎ তপন সরকার জিগেস করলেন, 'আচ্ছা মিস্টর চ্যাটার্জি, কখনো কোনো মেয়েকে ভালোবেসেছেন আপনি—মানে, অনেক মেয়েকেই ভালো-বেসেছেন হয়তো, তাদের মধ্যে কার কথা বেশি মনে পড়ে আপনার?'

চ্যাটার্জির মুখের উপর একটি হাসির ছায়া ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেলো। —'আজ মনে হয় তারা অনেক নয়, তারা এক, জীবন ভ'রে একজনকেই ভালোবেসেছি আমি, নানা রূপে দেখা দিয়েছে তারা, নানা নামে, নানা অবতারে। আজ যদি তাদের কথা ভাবি, একজনের মধ্যে আর-একজন মিশে যায়, ভালো ক'রে কিছুই যেন মনে পড়ে না, আবার হঠাৎ এমন কিছু মনে পড়ে যার কোনো ভাষা নেই।—মানুষের জীবনটা বড়ো ছোটো, শুধু বেঁচে থাকবারই সময় পাওয়া যায়, সেই বেঁচে-থাকাকে নিংড়ে-নিংড়ে মধু বের করবার লগ্ন যেই এলো তখনই দেখা যায় যে

বেলা আর নেই।'

সরকার স্থির হ'য়ে চ্যাটার্জির দিকে একটু তাকিয়ে রইলেন, তারপর জিগেস করলেন, 'কোনটা বেশি ভালো লাগে—ভালোবাসতে না ভালো-বাসার কথা ভাবতে?'

'ও-দুটো এখন এক মনে হয় আমার,' চ্যাটার্জি ক্ষীণ হাসলেন, 'ব'সে-ব'সে ভাবি, সেই ভাবাটাও তো ভালোবাসাই। মানুষের দুটো জীবন আছে: তার দেহের জীবন আর মনের জীবন। বাস্তবের আর কল্পনার। কিন্তু কল্পনার জীবনকে পরিপূর্ণ ক'রে সে পেতেই পারে না, যতদিন দেহ তার দেউলে না হয়।—আর তার পরে কতটুকুই সময় থাকে বা।'

'আচ্ছা, মিস্টর চ্যাটার্জি,' সরকারের চোখে-মুখে হঠাৎ একটা নতুন চিন্তারছায়া পড়লো, 'আপনি তো অনেক বেঁচেছেন, অনেক ভেবেছেন—বলুন তো ভালোবাসা বলতে ঠিক কী মনে হয় আপনার।'

'কী মনে হয়?' মাথাটি চেয়ারের পিঠে হেলিয়ে চ্যাটার্জি তাকালেন জানলা দিয়ে বাইরে, কৃষ্ণপক্ষের পূর্ণবিকশিত অন্ধকারে। 'কী যেন,' একটু পরে গুনগুন ক'রে বললেন, 'ভালোবাসা বলতে কী যে বোঝায় আর কী যে না বোঝায় তা আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারিনি আমি। মানুষের অনেকগুলি বৃত্তিরই আমরা নাম দিয়েছি ভালোবাসা—তারা সকলে এক জাতের নয়, এক জগতেরও নয়। মনে পড়ে ছেলেবেলা থেকে কত লোকের মুখে কতবারই তো ভালোবাসা কথাটি শুনেছিলাম, কিন্তু সতেরো বছর বয়সে পাখির মুখে যখন শুনলাম, আমার বুক ফেটে বাঁশি বেজে উঠলো।'

আরো কিছু বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন চ্যাটার্জি, দু-তিন মিনিটের হাওয়া-ধূমাচ্ছন্নতার পর আবার বললেন, 'আপনার চোখের প্রশ্ন আমি পড়তে পেরেছি। আমার সেই সুদূর সতেরো বছরে পাখি আমাকে ভালোবেসেছিলো। ·· কথা বলতে-বলতে এমন ক'রে মনে পড়ছে তাকে, যেন

চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। কালো মেয়ে; কালো দুটি চোখ। চোখে-চোখেই ভালোবাসার জন্ম, চোখে-চোখেই তার জীবন—সেই মূঢ় সলজ্জ সেকালে আর-কোনো ভাষা আমাদের জানা ছিলো না। সকলের সঙ্গে সকলের গল্পগুজবের মধ্যে আমি ব'সে থাকতাম, সে-ও থাকতো—মনেই করতে পারি না যে দু-জনে দু-জনকে সোজাসুজি কিছু বলেছি—সেই না-বলাটাকেই মনে হ'তো বেশি বলা, তাতেই ভ'রে থাকতো দিনরাত্রি। আর-কোনো আশা ছিলো না, অবকাশ ছিলো না আর কোনো আশার।

'সেই পাখির মুখে একদিন কথা ফুটলো—ফুটলো শীতের রাত্রে, রাত তখন তিনটে; ফিকে জ্যোছনায় জড়ানো, মাঠে-মাঠে কুয়াশায় ছড়ানো সেই রাত। কল্পনা করুন মফস্বলের শহর, রেল-বাবুদের ক্লাবে শখের থিয়েটার দেখতে শহর ভেঙে পড়েছে, উৎসাহ মেয়েদেরই, পুরুষরা পার্শ্বচর মাত্র। কাজটা লোভনীয় নয়, কিন্তু আমি বেকার ব'লে (দু-মাস পরে কোনো পরীক্ষা না-থাকলেই ও-বয়সের ছেলেরা বেকার ব'লে গণ্য হয়) আমাকে জোর ক'রেই রাজি করালেন ওঁরা। মেয়েরা বসলেন চিকের আড়ালে, কিন্তু কণ্ঠস্বরের অবরোধপ্রথা কোনোকালেই তো ছিলো না।—সেই দৃষ্টাতীত অঞ্চল থেকে অদম্য কলধ্বনি রঙ্গমঞ্চের তর্জনগর্জনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চললো অবিরাম। মোটের উপর আমার মনে হচ্ছিলো যে একই সঙ্গে তিনটি জায়গায় ভিন্ন-ভিন্ন নাটকের পালা চলেছে—রঙ্গমঞ্চে, প্রেক্ষাগৃহে আর নেপথ্যে—কেননা আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনাতেও অত্যন্ত বেশি গোপনীয়তা ছিলো না—আর এই গোলমালের মধ্যে ঘুমে ঢুলতে-ঢুলতে আমি শেষ পর্যন্ত ব'সে ছিলুম নিতান্তই কর্তব্যপরায়ণতার তাগিদে। সকলের মুখেই শোনা গেলো যে নাটকটি হয়েছে যাকে বলে গ্র্যাণ্ড সক্সেস, শুধু মাঘমাসের রাত ব'লে একেবারেই যে ভোর ক'রে দেয়া গেলো না তা-ই নিয়ে ভোক্তাদের মনে বোধহয় একটু আক্ষেপ ছিলো, উদ্যোক্তাদের তো রীতিমতো।

'অভিনয়ের জায়গাটি শহরের বাইরে, যানবাহন কিছু নেই, দল বেঁধে-বেঁধে হাঁটতে লাগলো সকলেই। কিছুদূর পর্যন্ত সকলেরই এক রাস্তা, প্রায় সকলেই সকলের চেনা; আমার তাই মনে হ'তে লাগলো যে নাট্যশালা থেকে এখনো বেরিয়ে আসিনি, রঙ্গমঞ্চ আমাদের পিছু নিয়েছে। হঠাৎ জজ-সাহেবের মোটরটি চমক লাগিয়ে চ'লে গেলো সজোরে এবং সরবে, তার পরেই কেমন-একটা চুপচাপ, চোখের আর মনের একটা উদাস দূরস্পর্শিতা, যেমন লাগে ট্রেন চ'লে যাবার পর ছোটো স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকলে। চাঁদের আলোয় আবছা প'ড়ে আছে মাঠের পর মাঠ, কোনটা গাছ আর কোনটা তার ছায়া ঠিক ঠাহর হয় না, মানুষ যারা চলেছে তাদেরও যেন ছায়া ব'লে ভ্রম হয়। চোখ থেকে ঘুম মুছে গেলো আমার, চলার গতি দ্রুত হ'লো, তার আসল কারণটা নিশ্চয়ই এই যে হাওয়ায় ছিলো সুতীক্ষ্ণ শীত। কিছুক্ষণের মধ্যে সঙ্গিনীদের ফেলে আমি অনেকটাই দূরে চ'লে এলুম—সেটাকে কর্তব্যপালনে ত্রুটি ব'লে মনে করতে পারি না, কারণ ওঁদের দল জুটেছিলো মস্ত, গল্প করতে-করতে মৃদুমন্দ চালে এগোচ্ছিলেন, একটা সতেরো বছরের মোটা গলার ছেলে পাশে-পাশে থাকলে ওঁদের আলাপে বরং ব্যাঘাতই হ'তো। সত্যি বলতে, আমি তো ছিলুম শুধু শোভনতারক্ষার জন্য, তার চেয়ে বেশি কিছু বিপন্ন হ'লে ওঁরাই আমাকে রক্ষা করতেন।

'চলতে-চলতে হঠাৎ আমার মনে হ'লো বড্ড বেশি এগিয়ে এলুম না তো? নিশ্বাস নিয়ে দাঁড়িয়ে পিছনে তাকালাম—একটি একলা মেয়ে খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে আসছে না? নিশ্চয়ই ইনি মা-র কোনো উপদেশের বাহিকা, বা বৌদির কোনো আদেশের? কাছে আসতে দেখি, পাখি

"কী হয়েছে?"

"কী আবার হবে।"

"তবে?"

"তবে মানে ?"

"তুমি যে ?"

"মা-রা এত আস্তে হাঁটেন !"

"ওঁদের বলেছো ?"

"বলেছি।"

"কী বললেন ?"

"কিছু বললেন না।"

"তার মানে—"

"দাঁড়িয়েই থাকবে নাকি ?" পাখি আমার কথায় বাধা দিলো।

'আবার হাঁটতে লাগলুম, এবার পাশাপাশি দু-জনে। ওর সঙ্গে একটানা এতখানি কথা কখনো বলিনি এর আগে, মনটা কেমন ভরা-ভরা লাগলো, ভার-ভার।

'কিন্তু বাকি রাস্তাটুকু একটি আর কথা না। গতি দ্রুত হ'লো, বাঁধা শড়ক নেমে এলো মাঠের পায়ে-চলা পথে, পায়ে-পায়ে চোরকাঁটার আদর, নিশ্বাসে ঘাসের গন্ধ, একটু ভারি নিশ্বাস, শীতের স্পর্শ গালের উপর, আরো দ্রুত গতি। পাখি তখন চোদ্দ বছরের—সে-যুগের হিশেবে মস্ত মেয়ে, এবং সে-যুগের আদর্শ অনুযায়ী ধীরমধুর—কিন্তু সে-রাত্রে ও-দুটি বিশেষণের প্রথমটিকে পাখির পা দুটি অন্তত স্বীকার করেনি। আমি একটু অবাকই হলাম যে বাড়ির মধ্যে তাকে যদিও মনে হয় ভিন্ন জাতের, এই আকাশের তলায় আমার লয়েই তার লয়। তার দেহের সতেজ তরুণ প্রাণশক্তি, যার উচ্ছ্বাসের বাধা ছিলো অন্তঃপুরে, হঠাৎ এই অভাবনীয় রাত্রিতে সেটাকে পদে-পদে প্রশ্রয় দিতে পেরে নিশ্চয়ই তার ভালো লাগছিলো খুব—কিন্তু শুধুই কি তা-ই ? না, শুধু তা-ই নয়। আকাশ, আর জ্যোছনা, আর শীতের তীক্ষ্ণতা, আর দিগন্তের মুক্তি—

আর একটি ছেলে আর একটি মেয়ে—শুধু তা-ই কি হ'তে পারে কখনো?

'মাঠ মিলিয়ে গেলো শহরে, শহর সরু হ'লো পাড়ায়, ঘুমে বোঝাই বাড়ি, চাঁদ-চোর পুকুর, একটি মোড়, তারপরেই পাখিদের ছোটো একতলা। পিছনে তাকিয়ে দেখলাম, আমাদের অভিভাবিকাদের চিহ্নমাত্র নেই। চুপচাপ রইলাম দু-জনে: দেহ উষ্ণ, নিশ্বাস ঘন, চোখ উজ্জ্বল।

'আমি বললাম, "তুমি না-হয়—"

' "না, দাঁড়াই একটু।"

'আমারও তা-ই ভালো মনে হ'লো। এতক্ষণ অন্য কোনো চেতনাই ছিলো না: আকাশ আর মাঠ আর জ্যোছনায় ছিলো সংসারের বিস্মরণ, কিন্তু এই চিরপরিচিত পাড়ায়, পাখিদের ছোটো একতলার সামনে দাঁড়িয়ে, পাখির সুকঠোর কাকার কথা মনে ক'রে আমার বুক কাঁপতে লাগলো একটু-একটু, মনে হ'লো দোষ করেছি, ওঁরা এসে নিশ্চয়ই বকবেন—আর মাথা পেতে সেই বকুনি নেবার জন্য পাখিকে নিয়ে এইখানেই দাঁড়িয়ে থাকা উচিত আমার।

'একটু পরে পাখি বললো, "বাড়িটা আরো দূর হ'লে বেশ হতো।"

'আমি কিছু বললাম না। পাখি আবার বললো, "তোমারও তাই মনে হয় না?"

'আমি বললাম, "কিন্তু পথ তো ফুরোতোই।"

'পাখি একবার আমার মুখের দিকে তাকালো, জ্যোছনায় চিকচিক ক'রে উঠলো কালো চোখ দুটি। চোখ নামিয়ে নিয়ে বললে, "হেঁটে আসতে-আসতে কী ভাবছিলে তুমি?"

' "জানি না কী ভাবছিলাম।"

' "আমি ভাবছিলাম—"

' "কী?"

"ভাবছিলাম যে খুব তো ভালো লাগছে হাঁটতে, কিন্তু হাঁটছি ব'লেই পথ ফুরোচ্ছে।"

'কথাটা শুনে আমার হাসি পেলো। মনে পড়লো ছেলেবেলায় কেউ আমার হাতে নাড়ু দিলে আমার মন-খারাপ হ'য়ে যেতো এই ভেবে যে এটা এক্ষুনি তো ফুরিয়ে যাবে।

"আরো অনেক কথা ভাবছিলাম," পাখি বললো। "কিন্তু তোমাকে বলবো না—তুমি হাসবে।"

"বলো না।" আমার কথাটা অনুরোধ নয়, বরং অনুমতি।

"না, বলতে পারবো না।"

"পারবে না কেন?"

"ভুলেই গেছি।"

"এর মধ্যে ভুলে গেলে?"

"এই রকমই তো হয় আমার। তোমাকে বলবো ব'লে অনেক কথাই ভাবি, বলতে গিয়ে কিছুই মনে পড়ে না।"

"কেন?"

"কেন আবার। তোমাকে ভালোবাসি, তাই।"

'কথাটা শুনে মাথা থেকে পা পর্যন্ত আমি কেঁপে উঠলাম। পাখির দিকে না-তাকাবার জন্য মুখ ফেরালাম—মোড়ের কাছে ওঁদের দেখা যাচ্ছে।

'পাখির কাকিমা বললেন, "পাখি, তুই এত আগে-আগে চ'লে এলি!"

'রাত্রির প্রগাঢ়তা আর পথের নির্জনতা সম্বন্ধে আমার বৌদি একটা যথোচিত মন্তব্য করলেন, আর মা বললেন, 'দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আর ঠাণ্ডা লাগাতে হবে না—চল।'

'বাড়ি ফিরে বাকি রাতটুকু আর ঘুমোতে পারলাম না।'

চ্যাটার্জি চুপ করলেন। তাঁর সিগারে জ'মে উঠেছে দেড় ইঞ্চি

লম্বা শাদা-শাদা-ধূসর রঙের কোঁকড়া ছাই। কাচের পাত্রে সেটি ন্যস্ত ক'রে তিনি সিগার মুখে তুললেন আবার।

সরকার বললেন, 'তারপর?'

সরকারের দৃষ্টি অতিক্রম ক'রে তন্ময় চোখ দুটি বাইরের দিকে তুললেন চ্যাটার্জি। অবাক হ'য়ে দেখলেন, আকাশের অন্ধকার চিরে চাঁদের একটি টুকরো এসেছে বেরিয়ে—ক্লান্ত, ম্লান, অনিচ্ছুক—যেন তাঁর কথাই তাকে ডেকে এনেছে অসময়ের বিশ্রামের বিবর থেকে, যেন তাঁর বাকি কথা শোনবার জন্যই সে আকাশের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে ঠিক তাঁর মুখোমুখি। চ্যাটার্জি অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন চুপ ক'রে, তারপরে হঠাৎ আর-এক রাত্রির চাঁদ জ্ব'লে উঠলো তাঁর মনে।

'আর-এক দিনের কথা মনে পড়ছে,' আস্তে-আস্তে তিনি বলতে লাগলেন, 'এও দিন নয়, রাত্রি। সে-রাতেও জ্যোছনা ছিলো, বৈশাখের আকাশ-ঢালা জ্যোছনা। কলকাতায় আমার দাদার বাড়িতে পাখি দু-দিনের জন্য এসে উঠেছে—কালই চ'লে যাবে কার্সিয়ঙে স্বামীর কাছে। একান্ত-ভাবে মেয়ে-মহলের অধিকারভুক্ত সে, আমার সঙ্গে বলতে গেলে দেখাই হয়নি, দেখা হবে এমন আশাও ছিলো না। না, ঠিক বললাম না—আশা ছিলো, আশা তো মানুষের ইচ্ছার অতীত, ইচ্ছে করলেই তাড়ানো যায় না তাকে। আমি জানতাম পাখিকে শুতে দেওয়া হয়েছে আমার পাশের ঘরেই, তাই শুতে না-গিয়ে লণ্ঠন জ্বেলে বই খুলে বসেছিলাম, —তখনো কলকাতায় এমন বাড়ি ছিলো যাতে ইলেকট্রিকের আলো ছিলো না। আমার মনে হচ্ছিলো পাখি যে পাশের ঘরে আছে আর আমি জেগে ব'সে আছি, এটাই একরকমের সান্নিধ্যসম্ভোগ, একরকমের মিলন।

'রাত বাড়লো; একতলায় ঝি-চাকরের শব্দ মিলিয়ে এলো আস্তে-আস্তে, বারান্দায় বৌদির আড্ডা ভাঙলো, চাঁদের মায়া হার মানলো

ঘুমের কাছে। তারপর সমস্ত বাড়ি যখন চুপচাপ হ'য়ে গেছে, পাখি এক সময়ে আমার টেবিলের ধারে এসে দাঁড়ালো।

'নীল শাড়ি তার পরনে, গলায় চিকচিকে সোনা, হাতে ঝিনিঝিনি চুড়ি। আমি কিছুই বললাম না, চুপ ক'রে তাকিয়ে রইলাম শুধু। পাখি বললো, "আমি একজন ভদ্রমহিলা, আমাকে দেখে তোমার উঠে দাঁড়ানো উচিত।"

'আমি নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালাম।

'পাখি আমার বিছানার এক পাশে ব'সে বললো, "এত রাত জেগে বই পড়ছো?"

'আমি অস্ফুট হেসে পরিত্যক্ত বইখানার দিকে তাকালাম।

' "শুধু কি বই পড়বার জন্যই জেগে ছিলে?"

'অপরাধীর মতো মাথা নিচু করলাম। তার দেহের সৌরভ আমাকে পাগল ক'রে দিচ্ছিলো।

' "বিলেত যাচ্ছো নাকি শিগগিরই?"

' "কথা তো হচ্ছে।"

'কয়েক মিনিট পাখি চুপ ক'রে ব'সে রইলো, একেবারে স্তব্ধ, তারপর হঠাৎ এক ঝাপটায় উঠে দাঁড়িয়ে বললো, "জীবনে বড়ো হ'তে হবে তোমাকে, রাত জেগে শরীর নষ্ট কোরো না।" দু-পা এগিয়ে বললো, "শুয়ে পড়ো, আমি যাই।"

'আমি নিশ্চল, রুদ্ধশ্বাস।

' "তোমার আলোটা নিবিয়ে দিয়ে যাই—" এক ফুঁয়ে নিবে গেলো বাতি, একটু ধোঁয়া, কেরোসিনের গন্ধ একটু, ঘরে জেগে উঠলো নীল জ্যোছনা, ম্লান হ'লো শাড়ির ঘন-নীল, মুখে নামলো ছায়া, চোখের কালোতেই চোখ ডুবে গেলো, শুধু ঠোঁট দুটি আঁকা হ'য়ে রইলো চাঁদের আলোয়। এক মুহূর্ত

তাকে দেখলাম ও-রকম, তারপর আমার পাশ দিয়ে চ'লে যেতে-যেতে থমকে দাঁড়ালো, চকিতে ফিরে এসে দু-হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলো আমাকে. ঠোঁটের উপর চুম্বন ক'রে বললে, "এর বেশি আমি আর তোমাকে দিতে পারি না।"

'সে-রাতেও আর ঘুমোতে পারলাম না আমি—মনে হয়েছিলো আবার আসবে, কিন্তু আর এলো না।'

চ্যাটার্জি আর-একবার কফি ঢেলে নিলেন, পেয়ালায় ঠোঁট ভিজিয়ে তক্ষুনি বলতে লাগলেন আবার।

'আমি ভাবিনি পাখির সঙ্গে আর আমার দেখা হবে—তার জন্যে কোনো ইচ্ছেও হয়নি—কিন্তু দেখা হ'লো। তিরিশ বছরের মধ্যে ছড়িয়ে-ছড়িয়ে চার-পাঁচবার—অত্যন্ত সাধারণ সে-সব দেখাশুনো—আমিও সহজেই মেনে নিয়েছি সাংসারিক সামান্যতায় যৌবনের অহমিকার অবসান। শেষ দেখা হয়েছিলো তার ছোটো মেয়ের বিয়েতে, বছর দশেক আগে। কলকাতায় মস্ত বাড়ি ভাড়া নিয়ে খুব ঘটা ক'রে বিয়ে। আমি যখন গেলাম তখনও ভিড় জ'মে ওঠেনি। পাখি আমাকে একটা ঘরে আলাদা বসিয়ে বিশেষ যত্ন ক'রে খাওয়ালো। বেশ মোটা, খুব হাসিখুশি, ডুবে আছে সংসারের সুখে, বড়ো মেয়ের সৌজন্যলব্ধ নাৎনিরত্নটিকে হাতছাড়া করতে যা-একটু কষ্ট শুধু। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম যে পুত্রকন্যার বিবাহের অবশ্যম্ভাবী যোগফল হ'লো নাতিনাৎনির নামতা—আর বর্তমান নাৎনিটি আর যে খুব বেশিদিন অদ্বিতীয়া থাকবেন না, আজ তো আমরা সে-ই সম্ভাবনাকেই দ্বিগুণিত ক'রে দিলাম। কথাটা শুনে পিছনে মাথা হেলিয়ে হাসলো খুব।

'চ'লে আসবার সময় পুরোনো চেনাশোনা অনেকে এসে ঘিরে দাঁড়ালেন আমাকে—দীর্ঘকাল পরে তাঁদের আমি দেখলাম। ভালো লাগছিলো, আবার মনের মধ্যে কোথায় একটা কষ্টও হচ্ছিলো যেন। এঁরা আমাকে ছোটো দেখে-ছিলেন, ছেলেমানুষ দেখেছিলেন—এঁদের মুখে-চোখে কথায় আমার ছেলে-

বেলার চিহ্ন খুঁজে-খুঁজে হতাশ হলাম আমি। আমার মনে যে-ছবি এঁদের আঁকা আছে তার সঙ্গে এঁদের মিল নেই কিছুই, অথচ অন্য কোনোরকম ধারণা মনে আনাও আমার পক্ষে অসম্ভব, তাই সমস্তটাই কেমন অবাস্তব ঠেকছিলো আমার কাছে, যেন আমাকে কেউ জোর ক'রে একটা নাটকের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে, এখন কোনোরকমে পার্ট ব'লে পালাতে পারলে বাঁচি। অনেকেই অনেক কথা বলছিলেন আমাকে—সুখসেব্য কথা—কিন্তু একটু অবাক, একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে আমি চুপ ক'রেই ছিলাম। হঠাৎ আমার পিছন থেকে একজন ব'লে উঠলেন, "এ কী! তোমার চুল পেকেছে এরই মধ্যে!' আর-একজন উঁকি দিয়ে বললেন, 'তাই তো! এক গোছা শাদা!' এ বিষয়ে আমার দিক থেকে কোনো মন্তব্য বাহুল্য মাত্র, কেননা ইংরেজিতে যদিও সময়ের ঝুঁটি আঁকড়ে ধরবার উপদেশ পাওয়া যায়, আসলে সময়ই আমাদের কেশাগ্র আকর্ষণ ক'রে আছে। এই কথাটাই বললো-বলবো করছি, এমন সময় আমার মাথার পিছনে অত্যন্ত লঘু একটি স্পর্শ অনুভব ক'রে মুখ ফেরালাম। পাখির চোখে চোখ পড়লো আমার, হঠাৎ সে-চোখে এমন-কিছু দেখলাম যা এর আগে কখনো দেখিনি, না কৈশোরে না যৌবনে, বাস্তবেও না স্মৃতিতেও না, সে-চোখে যেন কৌতুকের ঝিলিক আবার করুণার কোমলতা, প্রশান্তি আর বেদনাকে একসঙ্গে দেখলাম, দূরত্ব আর অন্তরঙ্গতা'কে—আস্তে মাথা নেড়ে মৃদু গলায় সে বললে, "আমাদের অনিরুদ্ধ, তারও চুল শাদা হ'লো!' ব'লে আর-একবার আমাকে স্পর্শ করলো মাথায়। সঙ্গে-সঙ্গে আমার অন্তরাত্মা শিহরিত হ'লো, মনে হ'লো, ভালোবাসা কাকে বলে এতদিনে তা জানলাম প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সে, দেশে-বিদেশে সুন্দরীদের মদিরতা পরিপূর্ণ পান করবার পর এই কথা সেদিন আমার মনে হ'লো।'

চ্যাটার্জি কথা বন্ধ করলে, কিন্তু তাঁর মুখে বিশ্রাম প্রতিফলিত হ'লো না, যেন মনে-মনে এখনো কথা বলছেন তিনি, সে-কথার কোনোখানেই শেষ নেই।

আকাশের উত্তুঙ্গ আরোহণ ক'রে চাঁদ এরই মধ্যে চ'লে গেছে তাঁর দৃষ্টির পরিধির বাইরে, যেখানে চাঁদ ছিলো সেখানে শুধু একটি অস্পষ্ট নীল আভা ছড়িয়ে আছে, অন্ধকারে যেখানে ছিটেফোঁটা তারা ছিলো অনেক, সেখানে একটিমাত্র তারা চোখের মতো তাকিয়ে আছে ঠিক তাঁর মুখের দিকে।

যেন স্বপ্নের ভিতর থেকে একটি হাত বাড়িয়ে চ্যাটার্জি নতুন একটি সিগার তুলে নিলেন। দাঁত দিয়ে অগ্রভাগ ছিন্ন ক'রে বললেন, 'এবার আপনি বলুন তো, মিস্টার সরকার, এর মধ্যে কোনটাকে আপনার ঠিক ভালোবাসা মনে হয়?'

বন্ধুর প্রৌঢ় সৌন্দর্যের দিকে স্থির দৃষ্টিতে একটু তাকিয়ে থেকে সরকার বললেন, 'আপনি তো জানেন যে আসলে আমরা ভালোবাসাকেই ভালোবাসি, এই উপলক্ষ্যগুলি কিছু না— মানে, এগুলো উপলক্ষ্যই। কিন্তু আর সিগার ধরাবেন না, চারটে বাজলো, ঘুমোবেন কখন?'

১৯৪৬

১৯৩০ থেকে ১৯৪৩-এর মধ্যে বুদ্ধদেব বসুর বারোখানা ছোটোগল্প-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়: তার মধ্যে এরা আর ওরা ছাড়া বর্তমানে একখানাও ছাপা নেই। লেখকের সম্পাদিত 'গল্পসংকলন'—বাংলা ভাষায় এই ধরনের প্রথম গ্রন্থ—সেটিও বহুকাল নিঃশেষিত হয়েছে। অন্য যে-দুটি সংকলন গ্রন্থ বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে তাতে তাঁর সমগ্র রচনার একটি অংশ মাত্র সংগৃহীত হ'তে পেরেছে। অথচ এই বহুমুখী উজ্জ্বল লেখকের পূর্ণ পরিচয় বিচারসক্ষম পাঠকেরা সর্বদাই আকাঙ্ক্ষা ক'রে থাকেন। গত দশ বছরের মধ্যে লেখা কয়েকটি গল্প—যা ইতিপূর্বে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি—এই গ্রন্থে সংগ্রহ করা হ'লো। এর মধ্যে 'একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা' অবলম্বন ক'রে বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'মৌলিনাথ' উপন্যাস লিখছেন; কিন্তু উপন্যাস আর গল্পের স্বাদ স্বতন্ত্র, এবং 'মৌলিনাথে'র অনুরাগী পাঠকের কাছেও এই গল্পে বর্ণিত ভগ্ন-পণ্ডিত চিরকিশোর মৌলিনাথের আশ্চর্য চরিত্র আদরণীয় থাকবে, এবং তাঁর জীবনে দুই বোনের উপাখ্যানে পাওয়া যাবে গীতিকাব্যের অনুরণন। 'একটি কি দুটি পাখি'র স্মৃতিমন্থন, 'নতুন দেশে'র চোখে-মাত্র-দেখা নির্বাক 'নায়িকা', প্রথমা'য় প্রৌঢ়ের মনে মৃত, বিস্মৃত পত্নীর আকস্মিক আবির্ভাব, 'মুক্তি'তে বোমা পড়া বাড়ির উল্লসিত বালক-বালিকা—এই সমস্তই পাঠকের পক্ষে স্থায়ী আনন্দের উপকরণ; শুধু তা-ই নয়, চিত্তের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয়।